গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৩ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা | ১ জুন ২০২১ (ডিজিটাল) | www.ganadabi.com

ইয়াস ঝড় বিধ্বস্ত এলাকায় ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

২৬ মে ইয়াস ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপে সুন্দরবন অঞ্চলের ব্লকগুলি বিধ্বস্ত হয়েছে। এই এলাকার ভয়াবহ পরিস্থিতি বর্ণনা করে দ্রুত ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দাবি জানিয়ে এস ইউ সি আই (সি)-র জয়নগর ও কুলতলি বিধানসভা কেন্দ্রের দুই প্রাক্তন বিধায়ক কমরেড তরুণকান্তি নস্কর ও কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার ওই দিন মুখ্যমন্ত্রীকে নিচের চিঠিটি পাঠান ঃ

মাননীয়া মহাশয়া,

গত ২০ মে আপনাকে চিঠি লিখে আমরা আসন্ন ঘূর্ণিঝড়ের পরিপ্রেক্ষিতে সুন্দরবনের নদীবাঁধ অধ্যুষিত ব্লকগুলিতে দ্রুত কী কী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত সে সম্পর্কে কিছু দাবি জানিয়েছিলাম। এখন ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস বিধ্বস্ত এই ব্লকগুলির ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে নিম্নলিখিত বক্তব্যে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

১) আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন, সাগর ব্লকের গঙ্গাসাগর, মুড়িগঙ্গা ১ ও ২, ধবলাট, ধসপাড়া-সুমতিনগর ২ প্রভৃতি অঞ্চল সমেত প্রায় ৮০ শতাংশ জলের তলায় চলে গেছে। বিপন্ন মানুষ, যাঁরা বিভিন্ন ফ্লাড সেন্টারে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁরা বাড়ি ছাড়ার সময় খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যেতে পারেননি, তা নোনা জলে ডুবে নষ্ট হয়েছে। ফলে এখনই খাদ্যসংকট দেখা দেবে।

২) নামখানার মৌসুনী দ্বীপ, মদনগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মুড়াখালি, দেবনগর, ট্যাঁকার বাজার, হরিপুর, ঈশ্বরীপুর, নাদাডাঙা প্রভৃতি জায়গায় নদীবাঁধ ভেঙে জল ঢুকেছে।

৩) কাকদ্বীপ শহরে জল ঢোকায় বাজারের সকল দোকান ডুবেছে, দোকানের সামগ্রী নষ্ট হয়েছে। এছাড়া কাকদ্বীপের গঙ্গাধরপুর, হারউড পয়েন্ট, ভুবননগর প্রভৃতি জায়গা প্লাবিত হয়েছে।

৪) পাথরপ্রতিমার ১২টি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকা প্লাবিত হয়েছে।

৫) রায়দিঘি ব্লকের দক্ষিণ কঙ্কনদিঘির তিন জায়গায়, পুরকাইত পাড়ায়, দক্ষিণ শংকরের ঘেরি নারায়ণ মন্দির থেকে স্লুইস গেট প্রভৃতি জায়গায় বাঁধ ভেঙে গ্রামে জল ঢুকেছে।

৬) কুলতলির দেউলবাড়ি, নলগড়া, কৈখালি, গোপালগঞ্জ, ব্যাঙ্কের ঘাট, সানকিজাহান, দেবীপুর, ভুবনেশ্বরী, ঢাকিরমুখ, ডোঙাজোড়া, অম্বিকানগর, বৈকুণ্ঠপুর, নগেনাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে নদীর বাঁধ ভেঙে গ্রামে জল ঢুকেছে।

৭) গোসাবার সাতজেলিয়া, রাঙাবেলিয়া, কুমিরমারী, মোল্লাখালি, বাসন্তীর ঝড়খালি ও ভরতগড় এবং ক্যানিংয়ের ইটখোলা প্রভৃতি জায়গা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

৮) গোসাবার সাতজেলিয়া, কুলতলির ভাসা, কুলপীর ট্যাংরার চর সমেত সুন্দরবনের নানা জায়গায় গ্রামের মানুষ নিজেরা বাঁধ রক্ষা করার কাজ করেছেন, আমাদের দলের কর্মীরা তাতে হাত লাগিয়েছেন।

পাঁচের পাতায় দেখুন

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় উত্তর দুর্গাপুরের খোদারপাড় এস ইউ সি আই (সি) গ্রাম কমিটির সদস্যদের উদ্যোগে নামখানা কাশীনগর স্কুলে দুর্গতদের খাবারের ব্যবস্থা। ৩১ মে

বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কমরেড শঙ্কর সাহার জীবনাবসান

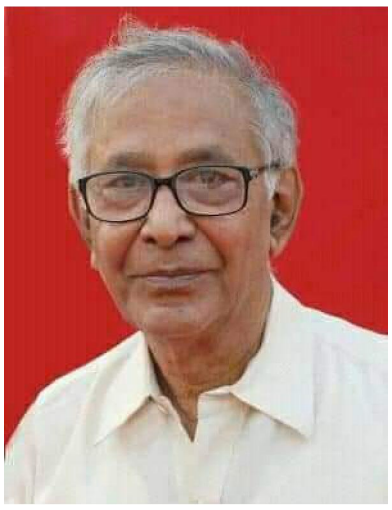

এস ইউ সি আই (সি) দলের কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটবুরো সদস্য, এ আই ইউ টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় সভাপতি এবং এ দেশের বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কমরেড শঙ্কর সাহা ৩১ মে সকালে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।

১২ এপ্রিল কমরেড শঙ্কর সাহা প্রবল জ্বর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। পরীক্ষায় দেখা যায় তিনি কোভিডে আক্রান্ত। প্রাথমিকভাবে তাঁর অবস্থা অনেকটা স্থিতিশীল থাকলেও পরে প্রবল অস্থিরতা এবং জটিল নিউমোনিয়া দেখা দেয়। ২৭ এপ্রিল তাঁকে ভেন্টিলেশনে দিতে হয়। দীর্ঘ চিকিৎসার পর ৮ মে তাঁর কোভিড নেগেটিভ রিপোর্ট আসে। কিন্তু তাঁর কিডনি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তাঁকে কয়েকবার হিমোডায়ালিসিস দিতে হয়। ধীরে ধীরে তাঁর অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক পর্যায়ে চলে যায়। চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর জীবন রক্ষা করা যায়নি।

কমরেড শঙ্কর সাহার মৃত্যুসংবাদে সারা দেশে দলের কর্মী-সমর্থক এবং শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর বিপ্লবী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দলের কেন্দ্রীয় কমিটি তিন দিন শোক পালনের আহ্বান জানায়। ২ জুন পর্যন্ত সমস্ত দলীয় কার্যালয়ে রক্তপতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।

ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটাল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কমরেড শঙ্কর সাহাকে প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের কর্মীরা মাল্যদান করে চোখের জলে বিদায় জানান। বেলা দু'টোর সময় ৪৮ লেনিন সরণিতে দলের কেন্দ্রীয় অফিসে তাঁর মরদেহ নিয়ে আসা হয়। ততক্ষণে নেতা-কর্মী-সমর্থকরা লকডাউনের মধ্যেই কেউ পায়ে হেঁটে কেউ সাইকেল কিংবা অন্য কোনও উপায়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন প্রিয় নেতাকে শ্রদ্ধা জানাতে। কমরেডদের সমবেত লাল সেলাম স্লোগানের মধ্যে লাল কাপড়ে মোড়া টেবিলে শোয়ানো হয় প্রয়াত নেতার মরদেহ। শুরু হয় শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের অনুষ্ঠান।

প্রথমেই দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের পক্ষে মাল্যদান করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং অফিস সম্পাদক কমরেড স্বপন ঘোষ। তারপর একে একে প্রবীণ পলিটবুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্যের পক্ষে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মানব বেরা, কমরেড মানিক মুখার্জীর পক্ষে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী মাল্যদান করেন। শ্রদ্ধা জানান পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু এবং কমরেড গোপাল কুণ্ডু। পলিটবুরো সদস্য কমরেড রাধাকৃষ্ণ, কমরেড সত্যবানের পক্ষ থেকেও শ্রদ্ধা জানিয়ে মাল্যদান হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড ছায়া মুখার্জী সহ উপস্থিত কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃবৃন্দ সহ কর্মী-সমর্থকরা শ্রদ্ধা জানান। কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে রচিত সঙ্গীত এবং আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের পর কমরেড শঙ্কর সাহা লাল সেলাম ধ্বনিতে কমরেডরা তাঁকে বিদায় জানান।

মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় এ আই ইউ টি ইউ সি-র কেন্দ্রীয় অফিসে। যে অফিসের সাথে বহু বছর জড়িয়ে আছে কমরেড শঙ্কর সাহার বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি। সেখানে মাল্যদানের পর শুরু হয় শেষ যাত্রা। রক্তপতাকাবাহী বাইকের সারিবদ্ধ মিছিল সহকারে কমরেডরা নিয়ে যান প্রিয় নেতার মরদেহবাহী গাড়ি। মিছিল পৌঁছায় কেওড়াতলা শ্মশানে। অশ্রুসজল চোখে মুষ্ঠিবদ্ধ হাতে বিপ্লবী অভিবাদনের সঙ্গে তাঁকে বিদায় জানান নেতা-কর্মী-সমর্থকরা।

কমরেড শঙ্কর সাহার মৃত্যুতে ভারতের সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলন এবং শ্রমিক আন্দোলন গুরুতর ক্ষতির সম্মুখীন হল।

কমরেড শঙ্কর সাহা লাল সেলাম

ইয়াস বিধ্বস্ত গ্রামবাসীদের জন্য ত্রাণ

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার গোসাবা ব্লকের রাঙাবেলিয়া অঞ্চলে সর্বস্ব হারানো মানুষদের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দিচ্ছেন দলের কর্মীরা। আরও ত্রাণের জন্য রাজ্যের জনগণের কাছে দলের পক্ষ থেকে উদার হাতে সাহায্যের আহ্বান জানানো হয়েছে

হিঙ্গলগঞ্জে পার্টির প্রতিনিধি দল, স্থায়ী নদীবাঁধের দাবি

ঘূর্ণিঝড়ে হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকে রূপমারি অঞ্চলের রূপমারি কুমিরমারি হলদা বাঁশতলি গ্রাম গৌড়েশ্বর ও ডাসা নদীর প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায়। এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কমিটির এক প্রতিনিধিদল ৩১ মে এলাকা পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অজয় বাইন ও গোকুল রায় চঞ্চল পালিত। তাঁরা বলেন, এখনও পর্যন্ত এলাকার নদী বাঁধ দেওয়া সম্ভব হয়নি। জোয়ার-ভাটা চলছে। প্রতিটি ঘরের মধ্যে জল। রান্না করার জায়গা নেই। সরকারি ত্রাণ এখনও পর্যন্ত পৌঁছয়নি। অত্যন্ত করুণ দশা। এলাকার মানুষের দাবি ত্রাণ নয়, কংক্রিটের নদীবাঁধ চাই। কুমিরমারি গ্রামে ১ জুন থেকে এক সপ্তাহ কমিউনিটি কিচেন চলবে।

জি-প্লটে বাঁধ রক্ষায় গ্রামবাসীরা

দক্ষিণ ২৪ পরগণার পাথরপ্রতিমা থানার জি-প্লটে ২৬ মে ইয়াসের প্রবল জলোচ্ছ্বাসে বাঁধ ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হলে গ্রামবাসীরা ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন বিপন্ন করে বাঁধরক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। গ্রামবাসীদের পক্ষে ভবসিন্ধু দাস ও শঙ্কর দাস বলেন, আয়লায় বাঁধ ভেঙে যাওয়ার পর সরকারি অনুমোদন হয়ে গেলেও নানা বাহানায় নতুন বাঁধ নির্মাণ শুরু হয়নি।

প্রশাসনিক গাফিলতির ফলে গোটা গ্রামের মানুষের জীবন আজ এমন বিপদের সম্মুখীন। তাঁরা অবিলম্বে কংক্রিটের স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু করার দাবি জানান।

দেশ জুড়ে ত্রাণ সংগ্রহের আবেদন কেন্দ্রীয় কমিটির

বিধ্বংসী ইয়াস ঝড়ে ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খণ্ডের বিস্তীর্ণ এলাকায় মানুষ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছেন। এই অবস্থায় দলের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে দলের কর্মী-সমর্থক-দরদি সহ জনসাধারণের কাছে দুর্গত মানুষের ত্রাণের জন্য দলের ত্রাণ-তহবিলে উদার হাতে সাহায্যের আবেদন জানানো হয়েছে।

কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলায় কোভিড হেল্পলাইন, কমিউনিটি কিচেন চালু

কোচবিহার জেলার পূর্ব খাগড়াবাড়ি এলাকায় নেতাজি সুভাষ দাতব্য চিকিৎসালয়ের পক্ষ থেকে ৫ মে করোনা আক্রান্তদের সহায়তার উদ্দেশ্যে কোভিড হেল্পলাইন চালু করা হয়। অনলাইনে টেলিক্লিনিক ও বিশেষ প্রয়োজনে সংস্থার ভলান্টিয়াররা সাধ্যমতো ওষুধ পৌঁছে দেওয়া ও অন্যান্য সাহায্য করছেন। ইতিমধ্যে লকডাউনের ফলে বহু দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ কাজ হারিয়ে অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছেন। বহু মানুষ কোভিডের কারণে সামাজিক বয়কটের জেরে খাদ্যসঙ্কটে দিন কাটাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে ২৩ মে কোভিড হেল্পলাইনের পক্ষ থেকে কোচবিহার শহর ও সংলগ্ন এলাকায় কোভিড আক্রান্ত ও লকডাউনে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের হাতে দু-বেলা রান্না করা খাবার পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু হয়।

দাতব্য চিকিৎসালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পেই রান্না করে খাবার বণ্টনের সূচনা করেন বিশিষ্ট শিশু বিশেষজ্ঞ, ক্যাম্পের সভাপতি ডাঃ দেবদাস মুখার্জী ও ক্যাম্পের সম্পাদক অমলেশ ভট্ট, রঞ্জিত বৈদ, শুভাশিস ঘোষ, কোভিড হেল্পলাইন এর যুগ্ম আহ্বায়ক ডাঃ অনুজ কুমার বিশ্বাস।

দুপুরে ও রাতে রিকশা চালক, ঠ্যালা চালক, ফুটপাত দোকানদার, ছোট দোকানদার সহ বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত প্রায় ৫০০ প্রান্তিক মানুষজনের কাছে প্রতিদিন রান্না করা খাবার প্যাকেট করে পৌঁছে দিচ্ছেন সংস্থার ভলান্টিয়াররা। আপাতত ১৫ জুন পর্যন্ত কিচেন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই কোভিড হেল্পলাইনে বিভিন্ন পেশার ২০০-র বেশি মানুষ যুক্ত আছেন বলে জানান নেপাল মিত্র। যাঁরা কোভিড ও লকডাউনের কারণে দুঃস্থ ও অনাহারে থাকা মানুষের নাম জানাতে চান এবং এই কাজে সামিল হতে চান তাঁদের যোগাযোগ করার আবেদন জানান সংস্থার পৃষ্ঠপোষক শিক্ষক সোমনাথ চৌধুরী।

ছয় মাস অতিক্রম করল দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন

অতিক্রান্ত হল ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের ৬ মাস। গণআন্দোলনের ইতিহাসে তৈরি হল এক অনন্য নজির। খোলা আকাশের নিচে ভয়ঙ্কর শীত, প্রবল গ্রীষ্ম এবং ভয়ঙ্কর অতিমারির মধ্যে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে অটুট থাকা সহজ বিষয় নয়। ইতিমধ্যে কয়েক শত সহযোদ্ধা প্রাণ হারিয়েছেন। আরও কত জনকে প্রাণ দিতে হবে কারও জানা নেই। এই আন্দোলন একই সাথে বিজেপি সরকারের চরম অগণতান্ত্রিক চরিত্রটাকেও নগ্ন করে দিয়েছে। কৃষি আইনের পিছনে কৃষক-কল্যাণের প্রচারটি কত বড় মিথ্যা, আন্দোলনরত কৃষকদের প্রতি সরকারের মনোভাবেই তা স্পষ্ট হয়ে গেছে।

অসম সাহসী এই আন্দোলনকে আরও জোরদার করতে ২৬ মে ছয় মাস পূর্তির দিনটিতে সংযুক্ত কিসান মোর্চার ডাকে দেশ জুড়ে পালিত

কালা দিবসে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ

হল কালা দিবস। কৃষক সংগঠন এআইকেকেএমএস সহ নানা সংগঠনের উদ্যোগে দেশের সর্বত্র দিনটি পালিত হয় বিজেপি সরকারের কৃষক স্বার্থবিরোধী কালা আইন চালুর চেষ্টাকে ধিক্কার জানিয়ে। ওই দিন সারা দেশে কালো পতাকা তুলে মানুষ ধিক্কার জানিয়েছে বিজেপি সরকারের নীতিকে। এস ইউ সি আই (সি) দিনটিকে সর্বাত্মক সফল করার জন্য মানুষের কাছে আহ্বান জানিয়েছিল। লকডাউনের মধ্যে দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ সহ নেতা-কর্মীরা অনলাইনে কালা দিবসের দাবিগুলি তুলে ধরেন।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার অতিমারি করোনা পরিস্থিতিতে লকডাউনের সুযোগ নিয়ে গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে পার্লামেন্টে কোনও আলোচনা ছাড়াই চূড়ান্ত কৃষক স্বার্থবিরোধী তিনটি কৃষি আইন পাশ করিয়ে নেয়। এর বিরুদ্ধে দেশজুড়ে কৃষকরা প্রতিবাদে ফেটে পড়েন। সরকার এই প্রতিবাদে কর্ণপাত না করায় দেশের কৃষকরা সূচনা করলেন এক নজিরবিহীন আন্দোলনের। কৃষক এবং দেশের মেহনতি জনতার স্বার্থ-বিরোধী কালা কৃষি আইনের প্রতিরোধে ২৬ নভেম্বর দিল্লি অভিযানের ডাক দেয় দেশের কৃষক সংগঠনগুলির সংযুক্ত মোর্চা। আহ্বানে সাড়া দিয়ে নারী, পুরুষ, শিশু থেকে বৃদ্ধ অগণিত মানুষ রাজধানীর উপকণ্ঠে পৌঁছন। ওই দিনই কৃষক সংগঠনগুলির ডাকে সারা দেশে ধর্মঘট পালিত হয়। শত অত্যাচার করেও সরকার প্রতিবাদী কৃষকদের প্রতিবাদকে ভাঙতে পারেনি। দিল্লিতে ঢোকার রাস্তা সরকার ব্যারিকেড করে বন্ধ করায় দিল্লি সীমান্ত ঘিরেই শুরু হয় ঐতিহাসিক ধরনা। তা ৬ মাস পার করেও অব্যাহত রয়েছে। যত দিন যাচ্ছে কৃষকদের মনোবল ততই মজবুত হচ্ছে।

মোদি সরকার দেখানোর চেষ্টা করছে এই আইন তাঁরা কৃষকদের কল্যাণের জন্যই নিয়ে এসেছে। কেমন কল্যাণ? এই আইনের বলে চুক্তি চাষের ভিত্তিতে ব্রিটিশ আমলের নীলকর শাসনের পুনঃপ্রবর্তন ঘটাবে দেশি-বিদেশি কর্পোরেটরা। কৃষক ফসলের ন্যায্য দাম পাবে না। কর্পোরেটদের স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ে কোনও আদালতে আবেদন করা যাবে না, যেতে হবে আমলাদের কাছে। ঋণের ফাঁদে পড়ে কৃষকের মৃত্যু ও আত্মহত্যার মিছিল শুরু হবে। এই ভয়ানক পরিস্থিতি সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় দেশজুড়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। এই আশঙ্কা যে অমূলক নয় তা আরও স্পষ্ট হল যখন এই আইন চালু হওয়ার কিছুদিন আগেই দেখা গেল, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে কৃষিপণ্য মজুত করা ও তা নিয়ে খাদ্য ও ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন এবং বাণিজ্য করার জন্য বৃহদাকার ভাণ্ডার ও তৎসংলগ্ন কারখানা তৈরি করেছে আম্বানি ও আদানির মতো ধনকুবের কর্পোরেট মালিকরা। অর্থাৎ সরকারের সাথে আম্বানি-আদানিদের আগাম বোঝাপড়া হয়েই ছিল। তার ভিত্তিতেই এই কৃষি আইনগুলি আনা হয়েছে। ফলে কৃষক এবং সাধারণ মানুষ নিশ্চিত হয়ে যান এই আইনের বলে সরকার কৃষি ব্যবস্থাটাকেই একচেটিয়া কর্পোরেট মালিকদের হাতে তুলে দিতে বদ্ধপরিকর। এই আইনে একদিকে কৃষি উপকরণের দাম বৃদ্ধির ঢালাও ছাড়পত্র তারা কর্পোরেটদের দিয়েছে, অন্য দিকে চাষিদের কাছ থেকে সস্তা দরে সমস্ত ফসল কেড়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এ ষড়যন্ত্র আরও পরিষ্কার হল যখন, সরকার প্রায় কাছাকাছি সময় 'বিদ্যুৎ আইন সংশোধনী-২০২০' নিয়ে এল। কৃষি উৎপাদনের জন্য দীর্ঘকাল বিভিন্ন রাজ্যে সস্তায় বা বিনামূল্যে বিদ্যুতের যে সরবরাহ চলে আসছিল, তা বন্ধ করে দিয়ে সরকার কর্পোরেটদের হাতেই বিদ্যুৎ ব্যবস্থা তুলে দিয়ে তাদের বিপুল মুনাফা করার সুযোগ করে দিল। এ যেন অক্টোপাসের মতো চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে কৃষক ও সাধারণ মানুষের উপর পরিকল্পিত আক্রমণ। তা রোখবার জন্যই কৃষকরা দিল্লি অভিযানের ডাক দেন।

লাগাতার লড়াইয়ের নানা অভিজ্ঞতা, কৃষক সংগঠনগুলির সদস্যদের মতবিনিময়ের মধ্য দিয়ে এই ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন আজ উন্নত চেতনায় সমৃদ্ধ হয়েছে। আন্দোলনের বর্শামুখ সেই কারণে কেবল সরকারের দিকে নয়, তা কর্পোরেট দুনিয়ার নির্মম শোষণের বিরুদ্ধেও। এই আন্দোলনের একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে, তাঁরা মূল শত্রুকে চেনবার চেষ্টা করছেন। তারা ধরতে পারছেন, সরকারের পিছনে রয়েছে একচেটিয়া পুঁজির মালিকেরা, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শাসন মানে আসলে জনগণকে শোষণ। পুঁজিপতিদের সর্বোচ্চ মুনাফার স্বার্থেই যে বুর্জোয়া রাষ্ট্র, সরকার এবং তার আইন-আদালত-প্রশাসন চলে এ সত্য অনেকটা তাঁরা ধরতে পারছেন।

কিসান মোর্চা ঘোষণা করেছে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন জারি থাকবে। চলছে বিজেপি নেতা-মন্ত্রীদের বয়কট, আম্বানি-আদানিদের পেট্রল-ডিজেল পাম্প বয়কটও চলছে। আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ রাজ্যে রাজ্যে ঘুরে 'নো ভোট টু বিজেপি' আহ্বান নিয়ে সভা, সমিতি, মহাপঞ্চায়েত করেছেন। প্রচুর অর্থ ও প্রচার করেও বিজেপি জনরোষে বিভিন্ন জায়গায় গো-হারা হেরেছে। হরিয়ানা-উত্তরপ্রদেশে পঞ্চায়েত নির্বাচনে, পাঞ্জাবে পৌরসভা নির্বাচনে এবং পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে ব্যাপকভাবে পরাজিত হয়েছে বিজেপি। তবুও তারা মরিয়া। কারণ আম্বানি-আদানিদের কাছে তারা চুক্তিবদ্ধ।

আজ আবারও করোনা পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে বিজেপি সরকার ওত পেতে রয়েছে— কোনওভাবে যদি চলমান কৃষক আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যায়। বিজেপি নেতাদের পক্ষ থেকে ছদ্ম উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছে যে, এই অতিমারির সময়ে তাঁরা যেন আন্দোলন তুলে নেন। অতিমারি শেষ হলে আবার তাঁরা এসে ধরনায় বসবেন। বাস্তবে করোনাকে অজুহাত করে সরকার আন্দোলনকে ভাঙতে চায়। কৃষকরা জানিয়েছেন, তাঁর সব রকমের সাবধানতা নিয়েই আন্দোলন চালাচ্ছেন, তাঁদের জন্য উদ্বিগ্ন না হয়ে সরকার যেন দেশের মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, ওষুধ, অক্সিজেন এবং ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করে। আর সরকার যদি সত্যিই উদ্বিগ্ন হয় তবে অবিলম্বে কালা কৃষি আইন তুলে নিয়ে কৃষকদের সাথে আলোচনায় বসুক। কৃষকরা আন্দোলনকে আরও জোরদার করার সব রকম প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। ঐতিহাসিক এই আন্দোলনকে সাফল্যের দরজায় পৌঁছে দিতে আজ প্রত্যেক দেশবাসীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সজাগ ভূমিকা প্রয়োজন।

উত্তর ২৪ পরগণার স্বরূপনগরে কালা দিবস পালন। ২৬ মে

কৃষকদের দাবি মানতে সরকারকে বাধ্য করুন

আহ্বান এস ইউ সি আই (সি)-র

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৭ মে এক বিবৃতিতে বলেন,

ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী সংযুক্ত কিসান মোর্চার ডাকে সাড়া দিয়ে ২৬ মে 'কালা দিবস' পালন করার জন্য দেশের জনসাধারণকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

গত ছ'মাস ধরে দিল্লির বিভিন্ন সীমান্তে লক্ষ লক্ষ কৃষক সমস্ত বাধাবিপত্তি, হুমকি ও আক্রমণ উপেক্ষা করে যেভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন, আমাদের দেশের জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব। বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের আনা তিনটি কৃষি-আইনের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন চলছে।

এমনিতেই দেশে ইতিমধ্যেই বিপুল সংখ্যক মানুষ ভূমিহীন ও কর্মহীন। তার উপর লক্ষ লক্ষ ছোট চাষি ও কৃষিশ্রমিককে উচ্ছেদ করে মুনাফালোভী বহুজাতিকদের হাতে কৃষিজমি ও কৃষি উৎপাদন কুক্ষিগত করার লক্ষ্যে এই আইনগুলি তৈরি করা হয়েছে। গত ছ'মাসে কয়েকশত কৃষক এই আন্দোলনে শহিদের মৃত্যু বরণ করেছেন। তাঁদের আত্মত্যাগ, সাহস, অপ্রতিরোধ্য সংগ্রামী তেজ, দৃঢ়সংকল্প আমাদের দেশের শোষিত নিপীড়িত মানুষের কাছে প্রেরণাস্বরূপ। এই আন্দোলন শুধু কৃষকদের নয়, দেশের সর্বস্তরের মানুষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছে।

শুরু থেকেই আমাদের দল সর্বশক্তি নিয়ে এই আন্দোলনে সামিল রয়েছে। শেষ পর্যন্ত আমরা এই সংগ্রাম চালিয়ে যাব। কৃষকদের ন্যায্য দাবিগুলি মেনে নিতে ফ্যাসিস্ট বিজেপি সরকারকে বাধ্য করতে শ্রমিক-চাষি-ছাত্র-যুব-মহিলা সহ সমস্ত স্তরের জনগণকে যুক্ত করে দেশজোড়া আন্দোলন গড়ে তুলতে বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল ও শক্তিগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণই হল বর্তমান সময়ের দাবি।

ক্ষতিগ্রস্ত ফুলচাষিদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী ও উদ্যানপালন মন্ত্রীকে স্মারকলিপি

২৬ মে প্রবল সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া প্রভৃতির ফুলচাষ ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ফুলচাষিদের অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানিয়ে ২৭ মে 'সারা বাংলা ফুলচাষি ও ফুলব্যবসায়ী সমিতি'র পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রী এবং উদ্যানপালন মন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। কিন্তু রাজ্যের মুখ্যসচিব স্বাক্ষরিত দুয়ারে ত্রাণের যে নির্দেশিকা ঘোষণা করেছেন, তাতে ক্ষতিগ্রস্ত ফুলচাষিদের সাহায্য দেওয়ার বিষয়ে কোনও উল্লেখ নেই। এজন্য সমিতির পক্ষ থেকে ৩০ মে মুখ্যমন্ত্রী ও উদ্যানপালন দপ্তরের মন্ত্রীকে পুনরায় স্মারকলিপি পাঠানো হয়।

সারা বাংলা ফুলচাষি ও ফুলব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন, গত বছর লকডাউনে ফুলচাষিরা ভীষণভাবে সর্বস্বান্ত হয়েছিল। তার উপর এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে চাষিরা দিশেহারা। ক্ষুদ্র ফুলচাষিরা উপযুক্ত সরকারি সাহায্য না পেলে পরবর্তী চাষে হাতই দিতে পারবে না। সেজন্য দুয়ারে ত্রাণ কর্মসূচিতে ক্ষতিগ্রস্ত ফুলচাষিদের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান তিনি। অন্যদিকে কৃষক ও খেতমজদুর সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক পঞ্চানন প্রধান বলেন, অতিবৃষ্টির দরুন সবজি চাষের ব্যাপক ক্ষতি হলেও ওই চাষিদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টি জিও-তে উল্লেখনেই। উক্ত চাষিদেরও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানান তিনি।

ইয়াস ঝড়ে দুর্গতদের সাহায্যে ত্রাণ সংগ্রহ

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুরে ত্রাণ সংগ্রহ করছেন দলের স্বেচ্ছাসেবকরা

ক্যানিং বাজারে দলের কর্মীরা ইয়াস বিধ্বস্তদের জন্য ত্রাণ সংগ্রহ করছেন

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরে ত্রাণ সংগ্রহ

কুলতলিতে বাঁধ সংস্কারের তদারকিতে এস ইউ সি আই (সি) নেতা কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার

বিডিও এবং অন্য প্রশাসনিক কর্তাদের সাথে আলোচনায় জয়কৃষ্ণ হালদার

ইয়াসের তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিস্তীর্ণ এলাকা। ২০ মে জরুরি ভিত্তিতে ভাঙা বাঁধ মেরামতের দাবি সহ বেশ কিছু দাবি ও পরামর্শ জানিয়ে কমরেড তরুণকান্তি নস্করের সঙ্গে যৌথভাবে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়েছিলেন কুলতলির প্রাক্তন বিধায়ক, এস ইউ সি আই (সি)-র নেতা জয়কৃষ্ণ হালদার। ইয়াসের ধ্বংসকাণ্ডের পর আবার চিঠি দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, ঝড়ের পরদিনই যখন প্রশাসনের দেখা নেই, তিনি ভুবনেশ্বরী এলাকায় স্থানীয় মানুষকে সংগঠিত করে বাঁধ মেরামতির কাজে নেমে পড়েন। পরদিন কুলতলির অন্যান্য জায়গাতেও তাঁকে একই ভূমিকায় দেখা যায়।

প্রশাসন ক্ষয়ক্ষতি পরিদর্শন করতে এলে কমরেড হালদারই এলাকার সাধারণ মানুষের পক্ষে তার বিবরণ এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দাবি বিডিও-র কাছে তুলে ধরেন।

দেশ জুড়ে 'কৃষি বাঁচাও, কর্পোরেট হটাও' দিবস পালনের ডাক

আগামী ৫ জুন অল ইন্ডিয়া কিসান-খেতমজদুর সংগঠন (এআইকেকেএমএস) সারা দেশ জুড়ে 'কৃষি বাঁচাও, কর্পোরেট হটাও' দিবস পালনের ডাক দিয়েছে। কেন এই কর্মসূচি? কারণ কৃষি আজ পুরোপুরি কর্পোরেটদের নিয়ন্ত্রণে। কৃষকের ভালমন্দ, বাঁচা-মরা সবই এদের উপর। কৃষক তার ফসলের ন্যায্য দাম পাবে কিনা, ন্যায্য মূল্যে কৃষি উপকরণ পাবে কিনা, সবই এদের উপর নির্ভরশীল। আবার বিশাল সংখ্যক অ-কৃষি জনগণ খাদ্যের ব্যাপারে কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষি কর্পোরেটদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেলে তারাও কর্পোরেটদের গ্রাসের মধ্যে পড়বেন। সেই কারণে এটা শুধু কৃষি ও কৃষকের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম নয়, সমস্ত জনগণের সংগ্রাম।

৫ জুন

সকলেই জানেন, বীজ, সার, কীটনাশক থেকে শুরু করে চাষের সব উপকরণ এখন বৃহৎ পুঁজিপতি বা কর্পোরেটদের নিয়ন্ত্রণে। তারা যে দাম নির্ধারণ করে সেই দামেই চাষিকে কিনতে হয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলনীতি যেহেতু সর্বোচ্চ মুনাফা, সেই কারণে তারা বিক্রির সময় যতদূর সম্ভব বেশি দাম বাড়ায়। এতে চাষের খরচ অত্যধিক বেড়ে যায়।

আবার পুঁজিবাদী বাজারে নানা নামে এরাই ক্রেতা। তারা মুনাফা সর্বোচ্চ করতে চাষির কাছ থেকে কেনার সময় দাম যতদূর সম্ভব কম দেওয়া যায় তার চেষ্টা চালায়। এই দ্বিমুখী শোষণে কৃষক সর্বহারায় পরিণত হয়। তারা জমি হারিয়ে পরিণত হয় কৃষি মজুরে। আবার গ্রামেও সারা বছর কাজ নেই। ফলে তারা গ্রাম থেকে উচ্ছেদ হয়ে এ রাজ্যে বা ভিন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে। ভারতে এই যে পরিযায়ী শ্রমিকের বিপুল সংখ্যা বৃদ্ধি তার পিছনে রয়েছে পুঁজিবাদী শোষণে জমি থেকে কৃষকের উৎখাতের ইতিহাস।

এতদিন ছোট মাঝারি বড় পাইকার ও ফড়েদের মাধ্যমে কৃষককে অভাবি বিক্রিতে বাধ্য করার প্রক্রিয়াটি চলছিল। এবার এই শোষণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে চলেছে সরাসরি কর্পোরেট পুঁজি। এই শোষণ প্রক্রিয়াটি যাতে কর্পোরেটরা নির্বিঘ্নে চালাতে পারে সেজন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সংসদে পাস করিয়ে নিয়েছেন নয়া কৃষি আইন, যার বিরুদ্ধেকৃষকরা ছ'মাস ধরে রাজপথে আন্দোলনে সামিল।

এই কৃষি আইনের জনবিরোধী ও কর্পোরেট স্বার্থবাহী চরিত্র বিশ্লেষণ করে ইতিপূর্বে গণদাবীর বিভিন্ন লেখা প্রকাশিত হয়েছে। আমরা দেখিয়েছি, মান্ডির বাইরে কৃষকদের থেকে সরাসরি কর্পোরেটদের কেনার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে কী ভাবে চাষী ঠকবে। আমরা দেখিয়েছি, বৃহৎ পুঁজিপতিদের কালোবাজারির স্বার্থে কী ভাবে ডাল, আলু, পেঁয়াজ, তৈলবীজ সহ বিভিন্ন পণ্যকে অত্যাবশ্যকীয় তালিকার বাইরে আনা হয়েছে। এর প্রভাব জনজীবনে পড়তেও শুরু করেছে। অতীতের সব হার ছাড়িয়ে রান্নার তেলের যে মূল্যবৃদ্ধি, তার পিছনে রয়েছে নয়া কৃষি আইন এবং সরকারের নিষ্ক্রিয়তা। কারণ এই আইনে বলা হয়েছে মূল্যবৃদ্ধি ১০০ শতাংশ না হলে এই আইন অনুযায়ী সরকার কোনও ব্যবস্থা নেবে না। এই বিপজ্জনক কৃষি আইন প্রতিরোধ সংগ্রাম শুধু কৃষকের সংগ্রাম নয়, সমগ্র জনগণের সংগ্রাম। আসুন, ৫ জুন 'কৃষি বাঁচাও কর্পোরেট হঠাও' দিবস পালনের মধ্য দিয়ে আন্দোলনকে কয়েক ধাপ এগিয়ে দিই।

পূর্ব মেদিনীপুরে ঘূর্ণিঝড় দুর্গতদের সাহায্য

প্রশাসনকে স্মারকলিপি

সম্প্রতি ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে হুগলি ও হলদি নদীর তীরবর্তী হলদিয়া পৌরসভার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড জলমগ্ন। কয়েক হাজার মানুষ বিপর্যস্ত। ত্রাণশিবিরে হাজার হাজার মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। ঘরবাড়ি জলের তলায় চলে যাওয়ায় বাড়ি ফিরতে পারেনি বেশিরভাগ মানুষ। ধান-চাল-সবজি-বরোজ, পুকুরের মাছ, অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী জলে ভেসে নষ্ট হয়ে গেছে। দূষিত জল জমে আগামী দিনে নানা অসুখের আশঙ্কায় এলাকার নাগরিকরা উদ্বিগ্ন। দলের বিভিন্ন গণসংগঠন দ্রুত ত্রাণকার্যে নেমে পড়ে।

পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে ৩০ মে দলের এক প্রতিনিধি দল হলদিয়া পৌরসভার ২১ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ড সহ নানা এলাকা পর্যবেক্ষণ করে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন দলের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রণব মাইতি, হলদিয়া লোকাল কমিটির সম্পাদক নারায়ণ প্রামাণিক, ছাত্র নেতা শ্যামসুন্দর দাস, সংগঠক শম্ভু মান্না প্রমুখ।

দলের পক্ষ থেকে পৃথক পৃথক প্রতিনিধিদল দীঘা, রামনগর, খেজুরি, নন্দীগ্রাম, হলদিয়া, মহিষাদল, তমলুক, কোলাঘাটের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। অবিলম্বে দুর্গত এলাকায় পানীয় জল, খাদ্য, পুনর্বাসন, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং দ্রুত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য বিডিও, এসডিও এবং ডিএম-এর কাছে দলের পক্ষ থেকে সাহায্য ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে অনলাইন ডেপুটেশন দেওয়া হয় ওই দিনই। মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও ওই দিন স্মারকলিপি দেওয়া হয়। ওই দিন তমলুক শহরের রূপনারায়ণের পাড়ের জলমগ্ন বাসিন্দাদের যে স্কুলের ক্যাম্পে রাখা হয়েছিল, সেখানে জেলা কমিটির সদস্য জ্ঞানানন্দ রায়ের নেতৃত্বে দলের এক প্রতিনিধিদল দুর্গতদের মধ্যে মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিলি করেন। কোলাঘাট সেচ দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

শিক্ষকরা ত্রাণে ঃ প্রাথমিক শিক্ষকরা তমলুক বিধানসভার ধলহরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ১০০ জন দুর্গতদের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বন্টন করেন। মাধ্যমিক শিক্ষকদের পক্ষ থেকে ৩১ মে খেজুরি ও হলদিয়ায় দুর্গতদের মধ্যে খাদ্য সহ ত্রাণসামগ্রী বন্টন করা হয়েছে।

ছাত্রদের ত্রাণ বিতরণ ঃ রামনগর বিধানসভার দক্ষিণ পুরুষোত্তমপুরের ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত এলাকায় এআইডিএসও-র উদ্যোগে ৩১ মে এলাকার ১০০টি পরিবারকে খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হয়।

পূর্ব মেদিনীপুরের দক্ষিণ পুরুষোত্তমপুরে এআইডিএসও-র উদ্যোগে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

একের পাতার পর

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দাবি—

ক) অতীতের মতো দুর্নীতিতে প্রশ্রয় না দিয়ে দলমত নির্বিশেষে ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে যুক্ত করে সকল ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য সরকারি ত্রাণ, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক।

খ) নোনা জল ঢোকায় চাষের জমি ও মাছের পুকুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এগুলিকে দ্রুত নোনা জল মুক্ত করা হোক। যে সব পানচাষির বরজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাঁদের এবং অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক।

গ) ভাঙা ও ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িগুলি মেরামতের জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়া হোক এবং দলীয় সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে তা বন্টন করা হোক।

ঘ) যাঁদের দোকানঘর ভেসে গেছে তাঁদের আর্থিক সাহায্য করা হোক।

আমাদের প্রত্যাশা আপনার সরকার জনস্বার্থে দ্রুত এই ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করবে।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি) দলের কোচবিহার জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য গণআন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব কমরেড কাজল চক্রবর্তী ২৭ এপ্রিল ভোরে স্থানীয় এক নার্সিংহোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের কর্মী-সমর্থকরা নার্সিংহোমে এসে উপস্থিত হন। তাঁর মরদেহ মিছিল সহকারে নিয়ে যাওয়া হয় ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে। সেখানে দলের জেলা সম্পাদক কমরেড শিশির সরকার, অসিত দে, নেপাল মিত্র, নৃপেন কার্যী সহ অন্য অনেকেই শ্রদ্ধা জানান। স্থানীয় শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। বহু সাধারণ নাগরিক শোক প্রকাশ করেন এবং বিভিন্ন এলাকায় মানুষ সন্ধ্যায় মোমবাতি জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

১৯৭৪ সালে কমরেড কাজল চক্রবর্তী দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর প্রাক্তন সদস্য কোচবিহারের প্রথম জেলা সম্পাদক প্রয়াত কমরেড সুব্রত চৌধুরীর সংস্পর্শে আসেন এবং এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী চিন্তানায়ক মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাকে জীবনাদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন। এরপর থেকেই তিনি দল ও দলের বিভিন্ন গণ সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। উজ্জ্বল কেরিয়ারের প্রলোভন থাকা সত্ত্বেও কমরেড কাজল চক্রবর্তী কষ্টকর অথচ মর্যাদাময় রাজনৈতিক জীবনকেই গ্রহণ করেছেন।

১৯৭৮ সালে কোচবিহারে এআইডিএসও-র প্রথম জেলা সম্মেলনে কমরেড কাজল চক্রবর্তী সংগঠনের জেলা সভাপতি নির্বাচিত হন। কোচবিহার শহরের এমজেএন হাসপাতালে চিকিৎসার ক্ষেত্রে দালাল চক্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং ওয়েলফেয়ার সংগঠন গড়ে তুলে নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেন। ভাষাশিক্ষা আন্দোলনে পার্টির নির্দেশে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সদস্য প্রয়াত কমরেড সুকোমল দাশগুপ্ত ও কমরেড সুব্রত চৌধুরীর নেতৃত্বে ছাত্রদের দিয়ে ছাত্র সংগ্রাম কমিটি, জেলার শিক্ষক অধ্যাপক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে যুক্ত করে শিক্ষার অধিকার রক্ষা কমিটি গড়ে তোলায় অন্যতম সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই তিনি বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কাজকর্ম শুরু করেন। এই সমিতির প্রথম জেলা সম্পাদক ও পরবর্তীকালে জেলা সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। জেলা জুড়ে শিক্ষক আন্দোলন গড়ে তুলতে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। শিক্ষক সংগঠগুলির যৌথ মঞ্চ জয়েন্ট কাউন্সিল অফ স্কুল টিচিং অ্যান্ড নন-টিচিং এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের আন্দোলনেও তিনি সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। সরকারি রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তাঁর স্কুলে তিনি পাশ-ফেল প্রথা ও ইংরেজি চালু রেখেছিলেন। সরকার ও ক্ষমতাসীন শাসকদলের বহু আক্রমণ ও ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করে চতুর্থ শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষা চালু করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তিনি বৃত্তি পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, ছাত্রদের কাছে একজন সংবেদনশীল আদর্শ শিক্ষক ও অভিভাবক।

বাসভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনে নেতৃত্বকারী ভূমিকা নিয়ে তিনি ভয়াবহ পুলিশি নির্যাতনের শিকার হন। তাঁকে দীর্ঘ কারাবাস করতে হয় এবং বহু মিথ্যা মামলায় তখনকার শাসকদল তাঁকে জড়িয়ে দেয়। ছিটমহল বিনিময়ের আন্দোলন, এনআরসি বিরোধী আন্দোলন, নারী নির্যাতন ও খুনের প্রতিবাদে নাগরিক কমিটির নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলন, উত্তরবঙ্গ পাটচাষি আন্দোলন, পৌর এলাকার সমস্যা নিয়ে আন্দোলন প্রভৃতিতে নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেন। কোচবিহারে দলের প্রথম জেলা সম্মেলনে তিনি জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

কোচবিহার এবং পার্শ্ববর্তী জেলাতেও বিদ্যুৎ আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা নেন। আমৃত্যু তিনি ছিলেন কোচবিহার জেলায় বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির জেলা সম্পাদক ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি।

শরৎ জন্মশতবর্ষ উদযাপন, শহিদ ক্ষুদিরামের মূর্তি প্রতিষ্ঠায় তিনি সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। মনীষী চর্চায় তার উদ্যোগ ছিল প্রশংসনীয়। তিনি জেলায় প্রোগ্রেসিভ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তোলার দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি নানা ধরনের সামাজিক সাংস্কৃতিক কাজ করতেন। করোনা আবহের মধ্যেও অসম সাহসিকতার সঙ্গে রিলিফ ওয়ার্ক, রক্তদান শিবির, চিকিৎসায় সাহায্য করার কাজ স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে নিয়ে পরিচালনা করেছেন। কমরেড কাজল চক্রবর্তীর জ্ঞানচর্চার প্রতি আগ্রহ ছিল অপরিসীম। তিনি 'নয়া প্রতিরোধ', 'চিন্তা' সহ বিভিন্ন পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। দলের কাজ শুরুর প্রথম দিকে বহু দূরবর্তী প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়ে যোগাযোগ করেছেন। তাঁর কাছে জুনিয়র কর্মীরা মনের সমস্ত কথা নির্দ্বিধায় নিঃসংকোচে বলতে পারতেন। শাসকদলের ভয়াবহ আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে তিনি অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

ছোট বড় সকলের সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক ছিল আন্তরিক। অহংবোধ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তাঁর সচেতন সংগ্রাম ছিল। নেতৃত্বের কঠোর সমালোচনা গ্রহণ করতে এবং নির্দ্বিধায় তা মেনে চলতে পারতেন। তাঁর জীবন ছিল সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর। নিজের বাড়িতে থেকে শিক্ষকতা করেও তিনি সর্বক্ষণের কর্মীর মতোই কাজ করেছেন। শারীরিক অসুবিধা সত্ত্বেও প্রশ্নহীনভাবে তিনি দলের দায়িত্ব পালন করেছেন। এ বছরেও নির্বাচন পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের নির্দেশিত উন্নত রুচি-সংস্কৃতির আধারের ভিত্তিতে জীবন সংগ্রামে তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। দলই ছিল তাঁর জীবন। বাড়িঘর সহ সমস্ত কিছু দলের কাছে সমর্পণ করতে কখনওই দ্বিধাবোধ করেননি তিনি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দলের সঙ্গে একাত্মতার সংগ্রাম করেছেন। তাঁর প্রয়াণে গণতান্ত্রিক মানুষ হারাল তাদের এক আপনজনকে। বর্তমান সংকটকালে বামপন্থী আন্দোলনের এবং দলের বিরাট ক্ষতি হল। দল হারাল একনিষ্ঠ উন্নত চরিত্রের অধিকারী এক নেতাকে।

কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার জেলায় দলের সমস্ত লোকাল কমিটি তাঁর স্মরণসভার আয়োজন করে। কোচবিহার শহরের বিভিন্ন কমিটি, ক্লাব স্মরণসভা করে তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। ১৯ মে কোচবিহার জেলা কমিটি অয়োজিত স্মরণসভায় ফরওয়ার্ড ব্লক এবং সিপিএমের জেলা নেতৃত্বের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখা হয়। সিপিআইএমএল-এর পক্ষ থেকে শোকবার্তা পাঠানো হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির অফিস সম্পাদক কমরেড স্বপন ঘোষ। সভাপতিত্ব করেন কোচবিহার জেলা সম্পাদক কমরেড শিশির সরকার।

কমরেড কাজল চক্রবর্তী লাল সেলাম

সাম্রাজ্যবাদী ইজরায়েলের বর্বর আক্রমণের শিকার প্যালেস্তাইনের সাধারণ মানুষ

আবার উত্তপ্ত প্যালেস্তাইন। আবার সংঘর্ষ— যার একদিকে অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ইজরায়েলি সেনাবাহিনী, অন্যদিকে সাধারণভাবে নিরস্ত্র প্যালেস্তিনীয় জনগণ, ইট ও পাথর ব্যতীত অস্ত্র বলতে যাদের হাতে আর কিছুই নেই এবং তাদের হয়ে হাতে অস্ত্র তুলে নেওয়া হামাস যোদ্ধারা। অস্ত্র বলতে তাদের হাতেও সামান্য কিছু হাতে তৈরি রকেট— ইজরায়েলি অত্যাধুনিক অস্ত্রসম্ভারের সাথে যার কোনও তুলনাই চলে না। তবু এরই নাম দেওয়া হয়েছে যুদ্ধ। হামাসের পক্ষ থেকে ছোঁড়া রকেটসম্ভারের ছবি প্রচারিত হয়েছে বিশ্ব জুড়ে টিভিতে, খবরের কাগজে। ১১ দিনের সংঘর্ষে সাধারণ মানুষের প্রাণহানি, ক্ষয়ক্ষতির কথাও প্রচার পেয়েছে মেনস্ট্রিম মিডিয়ায়। যেটা প্রচারের আলো থেকে দূরেই থেকে গেছে তা হল, ইজরায়েলি সেনার শতগুণ শক্তিশালী আক্রমণের ছবি, শরণার্থীতে গিজগিজ করতে থাকা ফিতের মতো সরু গাজা স্ট্রিপে ইজরায়েলি সেনার বিমান হানা, অন্তত ৯৫০টি লক্ষ্যবস্তু গুঁড়িয়ে যাওয়ার ছবি, যার মধ্যে রয়েছে অন্তত ৪টি বহুতল আবাসিক বাড়ি, ৪০টি স্কুল, ৪টি হাসপাতাল। হ্যাঁ, ইজরায়েলি পক্ষেও হামাসের ছোঁড়া রকেট আক্রমণে মারা গেছে ১৩ জন— আন্তর্জাতিক মিডিয়ার কল্যাণে সে কথা আমাদের জানতে বাকি নেই কারওরই। কিন্তু নজরের অনেকটাই আড়ালে যেটা রয়ে গেছে তা হল, প্যালেস্তিনীয় পক্ষেও মৃত্যুর সংখ্যা অন্তত ২৫৪ জন, যার মধ্যে ৬৬ জনই শিশু। আহত অন্তত ১৯০০ মানুষ, ঘরবাড়ি হারানো নতুন উদ্বাস্তুর সংখ্যা ৭২,০০০। না, এই নিহত, আহত, ঘরবাড়ি হারানো মানুষগুলো কেউই কিন্তু হামাসের যোদ্ধা নয়, নিতান্তই সাধারণ মানুষ।

জিওনাবাদীদের অন্যায় আক্রমণ

এবারের ঘটনার সূচনা শেখ জারা এলাকাতে। পূর্ব জেরুজালেম থেকে মাত্র ২ কিলোমিটার উত্তরে এটি একটি ছোট্ট পাড়া মাত্র। যদিও তার ইতিহাস সুপ্রাচীন। দ্বাদশ শতব্দীতে সুলতান সালাদিনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক শেখ জাররাহ'র বাড়ি ছিল এই এলাকাতে। তাঁর কবরস্থলও এখানেই অবস্থিত। সেই থেকেই এলাকাটির নাম শেখ জারা। মিশ্র বসতিপূর্ণ জেরুজালেম শহরের এই অংশটিতে চিরকালই আরব মুসলমান জনসংখ্যারই সংখ্যাধিক্য। এমনকি উনবিংশ শতাব্দীতে অটোমান সুলতানদের আমলের জনগণনাতেও দেখা যায় এর সত্যতা। ১৯৪৮ সালে ইজরায়েল গঠনের পর আরব-ইজরায়েল যুদ্ধেএই অঞ্চল চলে যায় জেরুজালেম শহরের পূর্ব অংশের সাথে জর্ডনের হাতে। সেইসময় ইজরায়েল থেকে যে লক্ষ লক্ষ প্যালেস্তিনীয়কে উচ্ছেদ করে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, তাদের একাংশের পুনর্বাসনের জন্য ১৯৫৬ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরের পূর্ণ সহযোগিতাতেই এই অঞ্চলে জর্ডন সরকারের আনুকূল্যে গড়ে তোলা হয় উদ্বাস্তু কলোনি।

কিন্তু ইজরায়েল অধিকৃত পশ্চিম জেরুজালেম এবং প্যালেস্তিনীয় অধ্যুষিত পূর্ব জেরুজালেম-এর মধ্যে বিভেদ রেখাটিও গেছে এই অঞ্চলের মধ্য দিয়েই। ফলে ১৯৬৭-র যুদ্ধে ইজরায়েল জর্ডন নদীর সম্পূর্ণ পশ্চিম তীর (ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক) এলাকা নিজেদের দখলে নিয়ে আসার পর থেকেই ছলে-বলে -কৌশলে এই অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য কায়েমে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। ১৯৭০ সালেই ইজরায়েল একটি নতুন আইন তৈরি করে, যাতে বলা হয় পূর্ব জেরুজালেমে জর্ডন সরকার যেসব জায়গায় উদ্বাস্তুদের বসতি স্থাপন করেছে, সেখানকার জমির আইনি হস্তান্তরের দলিল কেউ না দেখাতে পারলে সেখানে তাদের দখলীসত্ত্ব স্বীকৃত হবে না। পুরনো দলিল দেখাতে পারলে যে কেউই সেখানকার জমি পুনর্দখল করতে পারবে। স্বাভাবিকভাবেই এই নতুন আইনের পূর্ণ সুযোগ নিতে উগ্র ইহুদিবাদী জিওনিস্ট গোষ্ঠীগুলি ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৭২ সালে ইজরায়েলি কাস্টডিয়ান জেনারেল এই অঞ্চলের বেশিরভাগ সম্পত্তিই বিভিন্ন ইহুদি ট্রাস্টের মালিকানাধীন বলে রেজিস্ট্রি করে। তারপর থেকেই এইসব ইজরায়েলি ট্রাস্টগুলি এই অঞ্চলের বিভিন্ন অংশের উপর নিজেদের মালিকানা দাবি করতে শুরু করে ও অধিবাসীদের কাছ থেকে বসবাসের জন্য ভাড়া দাবি করতে শুরু করে। অন্যদিকে ইজরায়েলি আদালতও এই অঞ্চলের জমিবাড়ির মালিকানা সংক্রান্ত বিভিন্ন পুরোনো দলিল, যা অটোমান আমলের রাজধানী ইস্তানবুলে সংরক্ষিত আছে, তা অস্বীকার করে ইহুদি ট্রাস্টগুলির পক্ষেই রায় দিতে শুরু করে। এইভাবে এখানকার বহু প্যালেস্তিনীয় সাধারণ নাগরিক উচ্ছেদ হতে থাকে এবং তার বদলে বাইরে থেকে আসা ইজরায়েলি ইহুদি সেটলারদের উপনিবেশ গড়ে উঠতে শুরু করে। এইভাবেই ২০০১ সালে এই অঞ্চলের বিখ্যাত আল-কুর্দ পরিবারের বাড়িও দখল করে তার অধিবাসীদের উচ্ছেদ করে তুলে দেওয়া হয় ইহুদি সেটলারদের হাতে। উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত এই পরিবারের তৎকালীন প্রধান, মাথার উপর ছাদহীন অবস্থায় তার ১১ দিন পরে প্রাণ হারান। ঐতিহাসিক পরিবারগুলিরই যেখানে এই অবস্থা, ১৯৪৮-এর পরে স্থাপিত বসতিতে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের অবস্থা তো সেখানে সহজেই অনুমেয়। অসংখ্য পরিবার সেখানে ইতিমধ্যেই এইভাবে আইনি পথে উচ্ছেদের শিকার হয়ে আক্ষরিক অর্থেই গৃহহীনে পরিণত। এই অবস্থায় আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ করে ইজরায়েলি শীর্ষ আদালতে বিচারাধীন আরেকটি মামলার রায় দান। প্যালেস্তিনীয়দের আশঙ্কা, এর ফলে নতুন করে ৫৭টি আবাসনের আরও অন্তত ৭৫টি পরিবার উদ্বাস্তুতে পরিণত হতে চলেছে। স্বাভাবিকভাবেই রায়দানের আগে থেকেই সমগ্র এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে।

অন্যদিকে বিষয়টি নিয়ে প্যালেস্তিনীয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য খুবই পরিষ্কার। এমনকি রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার কমিটিও তাদের দাবিকেই মান্যতা দিয়েছে। তাদের বক্তব্য হল, শেখ জারা সহ পূর্ব জেরুজালেম বাস্তবে ইজরায়েলের বেআইনি দখলীকৃত এলাকা। ইজরায়েলের বৈধ সীমানার বাইরে তার অবস্থান। তাই সেখানে ইজরায়েলের আইন কার্যকরী হতে পারে না। আর জমিবাড়ির মালিকানা সংক্রান্ত পুরোনো সমস্ত দলিল, যা ইস্তানবুলের লেখ্যাগারে সংরক্ষিত, তাকেও মান্যতা দেওয়া উচিত। যাই হোক, এবারের মামলার রায়দানের দিন ছিল ৯ মে, যার ফলে উপরোক্ত পরিবারগুলির মধ্যে অন্তত ৬টি পরিবার এখনই সরাসরি উচ্ছেদের শিকার হবে। তার আগেই ৬ মে পূর্ব জেরুজালেমে এই সম্ভাব্য রায়ের বিরুদ্ধে প্যালেস্তিনীয়রা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলে ইজরায়েলি পুলিশ আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নামে তাদের উপর আক্রমণ চালায়, ফলে উত্তেজনা ছড়াতে থাকে। এরপরে, ইজরায়েলি মিডিয়ার খবর অনুযায়ী, ৭ মে ইজরায়েলি পুলিশের উপর নাকি প্যালেস্তিনীয় পক্ষ থেকে আক্রমণ চালানো হয় (যদিও সেই আক্রমণের অস্ত্র হিসেবে কিছু ভাঙা ইটের টুকরো ব্যতীত কিছু তুলে ধরা ইজরায়েলি সংবাদমাধ্যমের পক্ষেও সম্ভব হয়নি)। কিন্তু সেই আক্রমণ দমন করতেই পাল্টা প্রতি আক্রমণে যেতে নাকি বাধ্য হয় ইজরায়েলি পুলিশ। এবং তা করতে গিয়ে তারা কাছেই থাকা বিখ্যাত আল আকসা মসজিদ এবং তার পার্শ্ববর্তী একটি ক্লিনিকে গ্রেনেড ছোঁড়ে। আল আকসা মসজিদে তখন ইদের আগের শেষ শুক্রবারের নমাজে অন্তত ৭০ হাজার মানুষের ভিড়। ফলে এই গ্রেনেড হামলায় ৩০০-রও বেশি মানুষ আহত হয়। এর পর থেকেই পুরো এলাকাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। প্যালেস্তিনীয় তরুণ-কিশোররা ইট পাথর ছুঁড়ে প্রতিরোধে নামে। আর অন্যদিকে ইজরায়েলি পুলিশ কাঁদানে গ্যাস, জলকামান, রবার বুলেট থেকে শুরু করে গ্রেনেড পর্যন্ত সবই যথেচ্ছ ব্যবহার করতে শুরু করে। পরদিন ৮ মে প্যালেস্তিনীয়রা দীর্ঘদিন ধরেই জেরুজালেমের উপর তাদেরও অধিকার দাবি করে জেরুজালেম দিবস পালন করে। সেই মিছিলের উপরও পুলিশের হামলা চলে। আহতের সংখ্যা ছাড়িয়ে যায় ৬০০-রও বেশি, যার মধ্যে অন্তত ৪০০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। এরই প্রতিরোধে হামাসের পক্ষ থেকে পরদিন রাতে প্রথম রকেট হামলা চালানো হয়।

উত্তেজনা বাড়তেই থাকে। ১০ মে দ্বিতীয়বার ইজরায়েলি পুলিশ আল আকসা মসজিদ ও সংলগ্ন এলাকা খালি করতে অভিযান চালায়। প্যালেস্তিনীয় পক্ষ থেকেও সাধ্যমতো প্রতিরোধ করা হয়। ফলে অন্তত ৩০০ পালেস্তিনীয় সাধারণ নাগরিক আহত হয়। অন্যদিকে ২১ জন ইজরায়েলি পুলিশও অল্পবিস্তর আহত হয়। প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ে অন্যত্রও। পশ্চিম তীরের অন্তত ২০০ জায়গায় বিক্ষোভ হয়। ইজরায়েলি পুলিশ ও সেনাবাহিনীও অত্যন্ত কঠোর হাতে সেই বিক্ষোভ দমন করতে অভিযান চালায়, যার ফলে অন্তত ১১ জন বিক্ষোভকারীর মৃত্যু ঘটে। ইজরায়েলি পক্ষে অবশ্য প্রাণহানি শূন্য। হামাসের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, ১০ মে সন্ধে ৬টার মধ্যে ইজরায়েলি দখলদারী সৈন্যদের শেখ জারা ছেড়ে সরে যেতে হবে। উল্লিখিত সময়সীমা পেরিয়ে গেলে তাদের পক্ষ থেকে দ্বিতীয়বার রকেট হামলা চালানো হয়, এবার গাজা থেকে। ইজরায়েলি সেনার দাবি মোট ১৫০টির মতো রকেট হামলা হয় তাদের উপর। এরপরেই ইজরায়েলি সেনা গাজা লক্ষ করে শুরু করে দেয় সরাসরি কামান থেকে গোলাবর্ষণ ও বিমানহানা। ফলাফল আগেই বর্ণিত।

ইহুদিরা আজ আর কোনও বিশেষ জনগোষ্ঠী নয়

ইজরায়েলি সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র অবশ্য এমনই— দেশ হিসেবে তার জন্মলগ্ন থেকেই, বা বলা ভালো তারও আগে থেকেই। ১৮৯০-এর দশকেই ইহুদিবাদী কিছু বুদ্ধিজীবী মধ্যপ্রাচ্যের এই অংশে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের উপর ভিত্তি করে এই অঞ্চলে ইহুদিদের জন্য একটি দেশ তৈরি করার পরিকল্পনা করতে শুরু করে। কিন্তু তাদের দাবি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে একেবারে প্রথম থেকেই। কারণ ইহুদি বলতে আজ থেকে দু'হাজার বছর আগে একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীকে বোঝালেও, বর্তমানে ইহুদি একটি ধর্ম সম্প্রদায় মাত্র, যারা ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। কোনও বিশেষ জনগোষ্ঠী নয়, বরং দু'হাজার বছর আগে বর্তমান প্যালেস্তাইন অঞ্চলে বসবাসকারী যে জনগোষ্ঠী ইহুদি নামে পরিচিত ছিল, তারাই দীর্ঘ এই দু'হাজার বছরে ইতিহাসের বিভিন্ন বাঁকের মধ্য দিয়ে এসে ওখানে ধর্মীয় অর্থে এক মিশ্র জনগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটিয়েছে। প্রথমে রোমান এবং তারপরে পূর্ব রোমান বা বাইজান্টিয়াম সাম্রাজ্যের অধীন থাকাকালীন এই অঞ্চলে খ্রিস্টধর্ম বিস্তারলাভ করে। পরে ইসলামিক সম্প্রসারণের সময় এই অঞ্চল আরব মিলিট্যান্ত ধর্ম প্রচারকদের অধীনে চলে গেলে জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। পরে আবার এই অঞ্চলেই জেরুজালেম পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে দ্বিতীয় সহস্রাব্দের প্রথম কয়েক শতকে পরিচালিত হয় ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেড। এইসময় ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, ইংল্যান্ড এবং ইউরোপের বিভিন্ন অংশ থেকে আসা ধর্মযোদ্ধা ও প্রচারকদের প্রভাবে আবার একধরনের খ্রিস্টীয় প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহ্যও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ১৪৯২ সালে স্পেনে গ্রানাদা ও আল আন্দালুস থেকে আগের মুসলমান মুর শাসকরা রেকনকিস্তার ধাক্কায় বিতাড়িত হলে

সাতের পাতায় দেখুন

বর্বর আক্রমণের শিকার প্যালেস্তাইন

ছয়ের পাতার পর

সেখানে তাদের আশ্রিত কয়েক লক্ষ মানুষের ইহুদি জনগোষ্ঠীও পুরোপুরি বিতাড়িত হয়। পশ্চিম ইউরোপীয় ও মুর জনগোষ্ঠীর ইহুদিরাও সেসময় এই প্যালেস্তাইন অঞ্চলের উদার মুসলমান শাসকদের বদান্যতায় সেখানেই আশ্রয় পায়। ষোড়শ শতব্দীতে সাইপ্রাস থেকে পর্তুগিজভাষী ইহুদিদের একটা অংশও অটোমান সুলতানদের ঔদার্যে এই অঞ্চলে আশ্রয় লাভ করে। ফলে স্বভাবতই এই অঞ্চলে গড়ে ওঠে এক মিশ্র সংস্কৃতি।

ইহুদি রাষ্ট্র গড়ে তোলার পিছনে মদত ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের

অন্যদিকে আজকের কট্টর জিওনবাদী মতবাদের জন্ম কিন্তু মধ্য ইউরোপে ১৮৯০-এর দশকে। অস্ট্রীয় সাংবাদিক টেওডোর হার্ৎসল ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত তাঁর "ড্যের ইউডেনস্টাট" নামক জার্মান ভাষায় লিখিত বইতে প্রথম একটি ইহুদি রাষ্ট্রের দাবি তোলেন। লক্ষ্য ছিল, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা এবং স্বভাবতই বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের একত্রিত করে ইহুদি ধর্মীয় মতে ঐতিহ্যশালী প্যালেস্তাইন অঞ্চলে সম্পূর্ণরূপে একটি ইহুদি রাষ্ট্র গড়ে তোলা। প্রথম দিকে তাঁর এই বক্তব্য স্বভাবতই বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীতে বিভক্ত ইউরোপীয় ইহুদিদের কাছে মনে খুব একটা দাগ কাটেনি। যদিও সেইসময় থেকেই বিশেষত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের একটা অংশ তাদের পিছনে দাঁড়াতে শুরু করে। তাদের মদতেই জিওনিস্টদের সংগৃহীত ফান্ড ইউডিশে কলোনিয়ালোবাঙ্কের প্রত্যক্ষ ইনভেস্টমেন্টে ১৯০২-০৩ সালে আজকের প্যালেস্তাইনের জাফাতে প্রতিষ্ঠিত হয় অ্যাংলো-প্যালেস্তিনিয়ান ব্যাঙ্ক (সেন ইয়ারে সিওনিসমুস, ডি ভেল্ট, কলোন, ১৯০৬, পৃঃ-১৯)। লক্ষ্য ছিল তাদের ভবিষ্যতের পরিকল্পিত ইজরায়েল রাষ্ট্রে ইহুদি মালিকানায় কৃষি ও শিল্পের বিকাশ ঘটানো ও পরিকাঠামো গড়ে তোলা। ১৯১৭ সালে বালফোর ডিক্ল্যারেশনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সরাসরিই প্যালেস্তাইনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে মুখ খোলে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পরিস্থিতি কিছুটা পালটায়। এই অঞ্চলের অধিকার সেইসময় অটোমান তুর্কিদের কাছ থেকে চলে যায় ব্রিটিশদের হাতে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে হাত মিলিয়ে এইসময়েই ইউরোপের ধনী ইহুদিদের একটা অংশ এই অঞ্চলে জমি কিনে চলে আসতে শুরু করে। অন্যদিকে রাশিয়ায় বিপ্লবের ফলে সে দেশ থেকে প্রতিক্রিয়াশীল ইহুদি ব্যবসায়ীদের যে অংশ পালিয়ে আসে, তারাও সেই সময় এখানেই ব্রিটিশদের মদতেই আশ্রয় পায়। ফলে ১৯২২ সালেই দেখা যায় এই অঞ্চলে ইহুদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে পৌঁছে গেছে ৮৩ হাজার ৭৯০ জনে (সার্ভে অব প্যালেস্তাইন, ১৯৪৬, ভল্যুম ১, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ - ১৪১)। এইসময় থেকেই ধীরে ধীরে এই মূলত ইউরোপীয় ইহুদি ধনী জনগোষ্ঠী পয়সার জোরে ও ব্রিটিশের মদতে স্থানীয় অনুন্নত, প্রায় অশিক্ষিত এবং কিছুটা যাযাবর আরব ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের কাছ থেকে সংগঠিতভাবে জমি কিনে নিতে শুরু করে। এরাই ছিল এই অঞ্চলে ইহুদি রাষ্ট্রের মূল দাবিদার, যার পিছনে স্বভাবতই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদেরও পরোক্ষ মদত ছিল। এখানে মনে রাখা দরকার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ইউরোপে অত্যাচারিত ইহুদিদের সাথে কিন্তু এদের কোনও সম্পর্ক ছিল না। বরং ইউরোপের বিভিন্ন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প থেকে ইহুদি বন্দিদের বাঁচানোর উদ্দেশ্যে এই অঞ্চলে পুনর্বাসন দেওয়ার একাধিক মরিয়া প্রস্তাবও এই সময় এই জিওনবাদীরা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। কারণ তাদের মতে ওই সর্বস্বলুণ্ঠিত, অত্যাচারিত ও দুর্বল জনগোষ্ঠী কোনও কাজের ছিল না, তাদের পরিকল্পিত জিওনবাদী শক্তিশালী রাষ্ট্রের জন্য ছিল তারা অনুপযুক্ত। ফলে ১৯৪৪ পর্যন্ত মাত্র ৫১০০০ ইউরোপীয় অত্যাচারিত ইহুদি প্যালেস্তাইনে আশ্রয় পায়। এরপরও ব্রিটিশের প্রত্যক্ষ মদতে ঠিক হয় মাসে মাত্র ১৫০০-র বেশি ইউরোপীয় উদ্বাস্তুকে সেখানে আশ্রয় দেওয়া যাবে না। ফলে ১৯৪৫-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষপর্যন্ত সেখানে আশ্রয় জোটে আরও মাত্র ২১০০০ ইহুদির (প্যালেস্তাইন কনফারেন্স, গভর্নমেন্ট পলিসি, এইচ সি ডেব, ১৯৪৭, ভল্যুম ৪৩৩, পৃঃ — ৯৮৫-৮৬)। এখানে মনে রাখা ভালো, এইসময়ে ইউরোপে ৬০ লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করা হয় এবং আরও ন্যূনতম সমপরিমাণ ইহুদি বিভিন্ন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে কাটাতে বাধ্য হন।

রাষ্ট্রসংঘ পরিকল্পিত 'দুই রাষ্ট্রনীতি' বিশ বাঁও জলে

যাই হোক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে সেখানে হলোকাস্টের ভয়াবহ চিত্র সামনে আসে। ফলে সারা বিশ্বের সহানুভূতি সেখানকার অত্যাচারিত ইহুদিদের প্রতি ধাবিত হয়। সেইসময় সেই সহানুভূতিকে কাজে লাগিয়েই রাষ্ট্রসংঘে ১৯৪৭ সালে প্যালেস্তাইনে একটি ইহুদি রাষ্ট্র গড়ে তোলার প্রস্তাব পাশ হয়। ঠিক হয় প্যালেস্তাইনকে দু'টি ভাগে ভেঙে একটি নবগঠিত ইহুদি রাষ্ট্র তৈরি করা হবে ও সেখানকার আরবিভাষী অন্যান্যদের জন্যও থাকবে আরেকটি রাষ্ট্র। ১৯৪৭-এর ২৯ নভেম্বর রাষ্ট্রসংঘে এই প্রস্তাব পাশ হওয়ার সাথে সাথেই উল্লসিত জিওনিস্টরা স্থানীয় আরবিভাষী মানুষের উপর হিংস্র আক্রমণ চালাতে শুরু করে, যার ফলে ১৯৪৭-৪৯, এই দু'বছরের মধ্যেই অন্তত ৭,১১,০০০ প্যালেস্তিনীয় মানুষ দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয় (জেনারেল প্রোগ্রেস রিপোর্ট ও সাপ্লিমেন্টারি রিপোর্ট টু দ্য ইউনাইটেড নেশন কনসিলিয়েশন কমিশন ফর প্যালেস্তাইন, ডিসেম্বর ১১, ১৯৪৯ -অক্টোবর ২৩, ১৯৫০)। ফলে ১৯৪৮-এ ইজরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময়ই প্যালেস্তিনীয় জনগোষ্ঠীর এক-চতুর্থাংশ পরিণত হয় উদ্বাস্তুতে। এরপর প্রথম আরব-ইজরায়েল যুদ্ধে মার্কিন-ব্রিটিশ অস্ত্র ও সাহায্যে বলীয়ান ইজরায়েল জয়লাভ করলে প্রায় সমগ্র প্যালেস্তাইন এলাকা জুড়ে তাদের রাষ্ট্রই প্রতিষ্ঠা পায়। আইন করে সেইসময়েই ইজরায়েল উদ্বাস্তু প্যালেস্তিনীয়দের দেশে ফিরে আসার সমস্ত অধিকার অস্বীকার করে। কেবল মিশরের হাতে থাকা প্যালেস্তাইনের একেবারে দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে সমুদ্রতীরে একটি ফিতের মতো সরু এলাকায় (গাজা) এবং জর্ডনের হাতে থাকা জর্ডন নদীর পশ্চিম তীরস্থ একটি অঞ্চলে এই উদাস্তু প্যালেস্তিনীয়দের জন্য বসতি গড়ে ওঠে। কিন্তু ১৯৬৭-র 'ছয় দিনের যুদ্ধে' এই এলাকাগুলিও ইজরায়েল দখল করে নেয়। বর্তমানে এই এলাকাগুলি তাদেরই মিলিটারি অকুপেশনে রয়েছে। ফলে ১৯৪৭ সালের পরিকল্পিত দুই রাষ্ট্র সমাধান নীতি বাস্তবে বিশ বাঁও জলেই নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদী ইজরায়েলের সঙ্গে শাসকদের ঘনিষ্ঠতার বিরুদ্ধে ভারতের যুদ্ধবিরোধী মানুষ

আমাদের দেশেও দীর্ঘ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের ঐতিহ্য থেকে সাধারণ মানুষ চিরকালই এই ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন সমস্যায় অত্যাচারিত ও নিজস্ব রাষ্ট্রবঞ্চিত প্যালেস্তিনীয়দের পক্ষেই ছিল, যেমন ছিল সারা পৃথিবীর আপামর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শান্তিপ্রিয় জনসাধারণ। দেশের মধ্যে এই জনমতের তীব্র প্রাবল্যের ফলেই আমাদের দেশের শাসক গোষ্ঠীও দীর্ঘ কয়েক দশকব্যাপী ইজরায়েলের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সেই সংগ্রামী ঐতিহ্যের স্মৃতি আজ আমাদের মনে সময়ের সাথে সাথে ফিকে হয়ে এসেছে। সেই সুযোগে আজ আমাদের দেশের সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীও নানা অছিলায় ইজরায়েলের সাথে সামরিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রেই সহযোগিতা ও এমনকি যৌথ পরিকল্পনা নিয়েও চলতে শুরু করেছে। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐতিহ্যের পরিপন্থী এই নির্লজ্জ নীতি থেকে সরে এসে আমাদের দেশের শাসকদের অত্যাচারিত প্যালেস্তিনীয়দের পক্ষে দাঁড়াতে বাধ্য করা— আমাদের দেশের সংগ্রামী মানুষের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। সেই লক্ষ্য তীব্র জনমত সংগঠিত করা ও আন্দোলন গড়ে তোলা তাই আজ আমাদেরও ঐতিহাসিক দায়িত্ব।

বিশ্ব জুড়ে ভ্যাকসিন বৈষম্য দেখিয়ে দিল পুঁজিবাদী বৈষম্যের নগ্ন রূপ

যুদ্ধ হোক বা দুর্ভিক্ষ, যখন মানুষ নির্বিচারে মারা পড়ে, ধনে-প্রাণে দেউলিয়া হয়, ঠিক সেই সময় ওৎ পেতে থাকা শোষক-পুঁজিপতিরা মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে লাভের কড়ি গোনে। তাদের মুনাফার হার ছাপিয়ে যায় আগেকার সমস্ত রেকর্ড। অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য, ওষুধসহ নিত্যপণ্যের মজুতদারি ও কালোবাজারি করেই এই কাজটা সারে তারা অবলীলায়। এখন যে কোভিড অতিমারির দ্বিতীয় ঢেউ সমগ্র বিশ্বকে তথা সাধারণ মানুষকে বিপর্যস্ত করে ফেলছে, ভারতসহ বিশ্বের দেশগুলোতে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটছে, সে সময়ও থেমে নেই কর্পোরেট পুঁজিপতিদের উদগ্র লালসা জনিত কালোবাজারির রমরমা। ওষুধ, অক্সিজেন থেকে শুরু করে প্রতিষেধক টিকা কোনও কিছুই এর আওতার বাইরে নেই। মুনাফার স্বার্থের কাছে কণামাত্র দাম নেই মানুষের জীবনের। সাধারণের জন্য যে জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা ছিল অতিমারি ঠেকাতে আশু প্রয়োজন, সরকারি নীতিতে তা এখন অমিল। অতিমারি ঠেকাতে বিশ্বের বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসকরা যে প্রতিষেধক গ্রহণের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করছেন, বিশ্ব জুড়ে দেখা দিয়েছে তার ভয়ঙ্কর আকাল।

এ দেশের দিকে তাকিয়ে দেখুন, বহু মানুষই প্রয়োজনীয় টিকা পাচ্ছেন না। যখন দাবি উঠছে সরকারি উদ্যোগে সকলের জন্য বিনামূল্যে টিকাদান প্রকল্পের, তখন কেন্দ্রীয় সরকার সেই দাবি কিছুতেই মানছে না। কর্পোরেট ফার্মা কোম্পানির স্বার্থই তাদের কাছে বড়। এমনকি জীবনদায়ী ওষুধ, পিপিই, ভেন্টিলেটর ও টিকার উপর থেকে জিএসটি সরাতেও রাজি নয় সরকার। যেখানে প্রয়োজন ছিল বিপুল উৎপাদন সেখানে মুনাফালোভী কোম্পানিগুলো উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করছে, সেই সুযোগে ব্যাপক দাম নির্ধারণ করে তার মুনাফাকে নিশ্চিত করতে চাইছে। উৎপাদনে স্বল্পতার জন্য সৃষ্টি হয়েছে বন্টনের ক্ষেত্রে ব্যাপক সংকট। অর্থের বিনিময়ে যদি বা বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে প্রতিষেধক পাওয়া যায়, সরকারি হাসপাতালগুলোতে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকলেও যথেষ্ট প্রতিষেধক মিলছে না। রয়েছে শহর ও গ্রামের বৈষম্য। কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের টিকা নীতি দেশের মধ্যে প্রতিষেধক বৈষম্য বাড়িয়ে তুলছে, যা ভয়ঙ্কর।

শুধু এ দেশে নয়, প্রতিষেধক বৈষম্য এখন বিশ্বজুড়ে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। উচ্চ আয়ের দেশগুলো যত পরিমাণ ভ্যাকসিন প্রথমে কিনে মজুত করে নিয়েছিল, নিম্ন আয়ের গরিব দেশগুলো তার ক্ষুদ্রাংশও পায়নি। একটা পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে উচ্চ আয়ের দেশগুলোতে বাস করেন বিশ্বের মাত্র ১৫ শতাংশ মানুষ। অথচ উৎপাদিত প্রতিষেধকের ৪৫ শতাংশ রয়েছে ওই দেশগুলোর হাতে। অপরদিকে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক বাস করেন নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে, অথচ তাদের হাতে মোট প্রতিষেধকের মাত্র ১৭ শতাংশ রয়েছে। যে কারণে বিত্তশালী দেশগুলি বিশেষ করে আমেরিকা, ব্রিটেন এবং ইজরায়েল সহ বেশিরভাগ দেশে ইতিমধ্যেই শিশু-কিশোরদের টিকাকরণ শুরু করলেও আফ্রিকা থেকে শুরু করে ভারত, ব্রাজিলের মতো অধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট দেশগুলোতে ৯০ শতাংশ মানুষই টিকা পাননি। বহু ক্ষেত্রেই সামনের সারির করোনা যোদ্ধারাও টিকা থেকে বঞ্চিত থেকে গেছেন। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে কোভিড সংক্রমণ রোধে হু-র উদ্যোগে গঠিত কোভ্যাক্স প্রকল্প বাস্তবে মুখ থুবড়ে পড়েছে। এই প্রকল্পটি তৈরিই হয়েছিল কোভিড অতিমারির জন্য যথেষ্ট পরিমাণ প্রতিষেধক তৈরি এবং বিশ্বজুড়ে তার সমবন্টনের উদ্দেশ্যে। ঘোষিত কর্মসূচি ছিল প্রতিটি দেশের মোট জনসংখ্যার কুড়ি শতাংশকে এই বছরের মধ্যে প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হবে। সেজন্য দেশে দেশে মোট ২০০

আটের পাতায় দেখুন

লাক্ষাদ্বীপে জনবিরোধী সমস্ত বিল অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর

এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৯ মে এক বিবৃতিতে বলেন, বিজেপির প্রাক্তন বিধায়ক, গুজরাটের প্রাক্তন মন্ত্রী, লাক্ষাদ্বীপের বর্তমান প্রশাসক প্রফুল খোড়া প্যাটেলের প্রস্তাবিত চূড়ান্ত জনবিরোধী ও অগণতান্ত্রিক বিলগুলি ৩৬টি দ্বীপ ও একটি কেন্দ্রীয় অঞ্চল নিয়ে গঠিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় এই দ্বীপপুঞ্জটির স্থানীয় বাসিন্দাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছে। আমরা এই জনবিরোধী বিলগুলির তীব্র নিন্দা করি।

প্রস্তাবিত লাক্ষাদ্বীপ প্রাণী সংরক্ষণ আইনে দ্বীপপুঞ্জে গোমাংস নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। কেন্দ্রশাসিত এই এলাকাটিতে অপরাধের হার দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন। তা সত্ত্বেও ইউএপিএ-র মতো কালা-আইনের ঢঙে তৈরি, প্রস্তাবিত অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনে যে কাউকে এক বছর পর্যন্ত গ্রেফতার করে রাখার একতরফা ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে প্রশাসককে। ঢোলেরা স্মার্ট সিটি তৈরি ও স্ট্যাচু অফ ইউনিটি স্থাপন করার জন্য গুজরাটে যে আইন আনা হয়েছিল, তারই অনুকরণে আনা হয়েছে প্রস্তাবিত লাক্ষাদ্বীপ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন। এতে পরিকল্পনা ও উন্নয়নের নামে দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দাদের জমি গ্রাস করার ক্ষমতা প্রশাসককে দেওয়া হয়েছে।

গত বছরের ২ ডিসেম্বর পদে নিযুক্ত হওয়ার পর থেকে বিজেপির এই প্রশাসক, দুটির বেশি সন্তান থাকলে পঞ্চায়েত ভোটে লড়া যাবে না, স্কুলে নিরামিষ খাবার চালু করা, শত শত অস্থায়ী কর্মীকে ছাঁটাই করা, মৎস্যজীবীদের আশ্রয়স্থলগুলি ধ্বংস করা, এনআরসি ও সিএএবিরোধী আন্দোলনকারীদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার করার মতো তুঘলকি আইন একের পর এক জারি করে চলেছেন। তিনি পর্যটকদের নিভৃতবাসের ব্যবস্থাও তুলে দিয়ে কোভিডের বিপদ বাড়িয়েছেন। এর আগে প্যাটেল যখন দিউ-এর প্রশাসক ছিলেন, সেখানেও তিনি একই ধরনের নির্মম পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এই সমস্ত পদক্ষেপ শুধু যে স্বৈরাচারী তাই নয়, মুসলিম সংখ্যাধিক্যের এই দ্বীপপুঞ্জে এগুলি সাম্প্রদায়িক বার্তাবহও বটে। পর্যটন ব্যবসা থেকে মুনাফা লুট করতে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সুবিধা করে দেওয়ার জন্য নিয়ে আসা, এলাকার সামাজিক বুনন ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য ধ্বংসকারী এই পদক্ষেপগুলি স্বাভাবিক কারণেই প্রবল বিক্ষোভ ধ্বনিত হয়েছে দ্বীপপুঞ্জে।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের দাবি, ১) অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে লাক্ষাদ্বীপের প্রশাসকের পদ থেকে প্রফুল খোড়া প্যাটেলকে অপসারণ করতে হবে এবং ২) একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থবাহী পদক্ষেপগুলি প্রত্যাহার করে স্থানীয় বাসিন্দাদের ইচ্ছাকে মর্যাদা দিতে হবে যাতে তাঁরা জীবিকা নির্বাহের জন্য অবাধে মাছ ধরা সহ অন্যান্য কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারেন।

বিশ্ব জুড়ে ভ্যাকসিন বৈষম্য

সাতের পাতার পর

কোটি ডোজ পাঠানোর কর্মসূচি ঠিক হয়েছিল এই বছরের মধ্যে। আশঙ্কা, এই কর্মসূচি সুদূরপরাহত থেকে যাবে। পরিসংখ্যান বলছে, নিম্ন আয়ের দেশগুলোর মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.১ শতাংশ মানুষকে এই টিকা দেওয়া গেছে। যেখানে উচ্চ আয়ের দেশের অর্ধেকের বেশি মানুষ এই টিকা পেয়ে গেছেন। আমেরিকা, ব্রিটেন, ইজরায়েলের মতো দেশগুলি ভ্যাকসিন আবিষ্কারের আগে থেকেই আগাম অর্থ দিয়ে জনসংখ্যার অনুপাতের চেয়েও বেশি ভ্যাকসিন কিনে নেয় এবং মজুত করে রাখে। অপরদিকে নিম্ন আয়ের দেশগুলো অর্থাভাবে ভ্যাকসিন পায় না। আফ্রিকার অত্যন্ত দরিদ্র দেশগুলোতে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর অভাব এতটাই যে কোভ্যাক্সিন প্রকল্পের ভ্যাক্সিন পেলেও তা সে দেশের সরকার দেশবাসীকে দিতেও পারে না, নষ্ট হয়। অথচ অতিমারি বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকরা সমস্বরে বলছেন, করোনা অতিমারি রুখতে এই বৈষম্য নিদারুণ প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে। কারণ অতিমারির চরিত্র এমনই যে সারা বিশ্বে একই সাথে টিকাকরণ কর্মসূচি না চালানো হলে করোনা অতিমারিকে সমূলে উৎপাটন করা কার্যত অসম্ভব। তা ছাড়া, এ না হলে শুধু দ্বিতীয় ঢেউতেই থেমে না থেকে ভাইরাস নিজের মিউট্যান্ট পাল্টে তৃতীয়- চতুর্থ ঢেউ আকারে আসতেই থাকবে বিশ্বজুড়ে, যা আরও প্রাণহানির কারণ হবে। মানব সভ্যতার পক্ষে যা হবে আত্মঘাতী।

এই ভ্যাকসিন বৈষম্যের কারণ কী? ভ্যাকসিন আবিষ্কারের পর তার পেটেন্ট বা উৎপাদন স্বত্ব কিনে নিয়েছে মুষ্টিমেয় কর্পোরেট পুঁজি মালিক। তারা লাভের উদ্দেশ্যেই ভ্যাকসিনের উৎপাদন ও বন্টন নিয়ন্ত্রণ করছে, যেমন খুশি দাম নির্ধারণ করছে। ভারত সহ বিভিন্ন দেশের ক্ষমতাসীন সরকারগুলো কর্পোরেট পুঁজির লেজুড়বৃত্তির কারণে অর্থাৎ পুঁজিপতিদের মুনাফা রক্ষার নিরিখে দেশের স্বাস্থ্যনীতি নির্ধারণ করার কারণে বিশ্বজুড়ে সার্বজনীন ভ্যাকসিন প্রদান কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ভারতেও বিজেপি সরকার দেশের সব মানুষের কাছে ভ্যাক্সিন পৌঁছে দেওয়ার থেকেও ভ্যাকসিন উৎপাদনকারী কোম্পানির মুনাফাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। তার ফলেই আজ দেশজুড়ে ভ্যাকসিনের এমন চূড়ান্ত সংকট দেখা দিয়েছে।

অথচ একদা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি দেখিয়ে দিয়েছিল প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর জোর দিলে বসন্ত -টিবির মতো রোগ-ব্যাধিকে অনেক আগেই রুখে দেওয়া যায়। কমিউনিটি মেডিসিন, জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামো, এপিডেমোলোজি তথা মহামারি নিয়ন্ত্রণের বিশেষ চিকিৎসা পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগ সোভিয়েত সমাজতন্ত্রই প্রথম দুনিয়াকে দেখিয়েছিল। এখনকার সমাজতান্ত্রিক দেশ কিউবা রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যনীতি সঠিক ভাবে প্রয়োগের ফলে কোভিড অতিমারিকে রুখে দিতে পেরেছে। এই প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যাওয়া মুমূর্ষু পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাই করোনা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। এই ব্যবস্থা যত দিন টিকে থাকবে তত দিন মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলতেই থাকবে। পুঁজিবাদী এই সমাজ ব্যবস্থার উচ্ছেদের প্রশ্ন আজ সভ্যতার টিকে থাকার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছে।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি) কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সলিল সেন ২০ মে সকালে আকস্মিকভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর।

কমরেড সলিল সেনের বাড়ি ছিল কলকাতার নিউ আলিপুর কলেজের খুব কাছে। ১৯৭০-'৭১ সাল নাগাদ সেখানে এআইডিএসও ছাত্রদের নানা দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলছিল। কয়েকটি ঘটনাক্রমে এই সংগঠনের আন্দোলনকারী কর্মীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। সেই সূত্রেই দলের বেহালা লোকাল কমিটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে অল্প কিছুদিন কাজ করেন তিনি। সেই সময়ে পার্টির কলকাতা জেলা সম্পাদক ছিলেন কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জী। তাঁর সংস্পর্শে এসে কমরেড সলিল সেন দলের সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে জীবন কাটাবার সিদ্ধান্ত নেন। কিছুদিনের মধ্যেই দলের নির্দেশে পার্টির প্রেসে কাজ শুরু করেন তিনি। সেই সময় ছাপার কাজ হত লেটার প্রেসে, অক্ষর সাজিয়ে। পার্টির মুখপত্র ও অন্যান্য পত্রপত্রিকার মেক-আপ সহ বিভিন্ন কাজ দ্রুত শিখে নিয়ে দায়িত্ব পালন করতে করতে প্রেসের সমস্ত কাজে দ্রুত দক্ষতা অর্জন করেন কমরেড সলিল সেন।

সময়ের সঙ্গে প্রেসে কাজের পদ্ধতিতে একাধিক বার ব্যাপক পরিবর্তন আসে। এই কমরেড প্রত্যেক বারই নতুন পদ্ধতিতে কাজের ক্ষেত্রে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করেছেন। বর্তমানে প্রেসে কম্পিউটারভিত্তিক ছাপাছাপির যে কাজ হয়, তার সূচনা তাঁর হাত ধরেই। বস্তুত কোনও প্রথাগত শিক্ষা ছাড়াই ছাপাছাপি বিষয়ক কম্পিউটারের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় তিনি আয়ত্ত করেছিলেন।

গণদাবী প্রেসই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। পার্টির কাজ শুরু করার সময় থেকে, অসুস্থ হয়ে ঘরবন্দি হওয়ার আগে পর্যন্ত বছরের পর বছর প্রেসের চার দেওয়ালের মধ্যে নীরবে নিজের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। দলের প্রচার এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার প্রসারে মুখপত্র ও প্রেসের অপরিসীম গুরুত্বকে হৃদয়ঙ্গম করে তিনি এই আপাত নীরস একঘেয়ে কাজটিকেই বিপ্লবী সৃষ্টিশীলতায় গ্রহণ করেছিলেন। চিকিৎসকদের বারণ সত্ত্বেও তাঁর প্রেসে আসা ঠেকিয়ে রাখা ছিল অত্যন্ত কঠিন। নিজের কাজে বিপুল দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও কখনও আত্মপ্রচার করেননি কমরেড সলিল সেন। দলের প্রয়োজনে বা কর্মী, শুভানুধ্যায়ী ও পরিচিত কারও অনুরোধে সব সময় বাড়িয়ে দিয়েছেন সাহায্যের অকুণ্ঠ হাত।

পার্টি-অর্পিত দায়িত্বের প্রতি নিষ্ঠার নজির রেখে গেছেন কমরেড সলিল সেন। তিনি হয়ে উঠেছিলেন পার্টির প্রকাশনা বিভাগের অন্যতম স্তম্ভ। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে বেরনো বন্ধ হয়ে গেলে টালিগঞ্জে যে বাড়িটিতে অন্য পার্টিকর্মীদের সঙ্গে তিনি থাকতেন, সেখানেই একটি কম্পিউটারের ব্যবস্থা করে কাজ শুরু করেন।

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে সারা জীবনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দলের রুচি-সংস্কৃতি-নৈতিকতার উঁচু মান অর্জন করেছিলেন কমরেড সলিল সেন। বাইরের আপাত কঠোরতার আড়ালে তাঁর স্নেহকোমল হৃদয়টি ছিল অত্যন্ত উদার। কারও ব্যবহারে আঘাত পেলে কখনও প্রত্যাঘাত করেননি। জুনিয়র কমরেডদের প্রতি ছিল অপার স্নেহ। প্রেসে কাজ নিয়ে গেলে তাদের খাওয়া-দাওয়া হয়েছে কি না খোঁজ নিতেন, না হয়ে থাকলে জোর করে খাইয়ে দিতেন। কেউ অসুস্থ হলে নিয়মিত খোঁজ রাখতেন। পার্টির পুরনো কর্মী-সমর্থক, বর্তমানে যাঁরা দৈনন্দিন কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত নেই, কমরেড সলিল সেন নিয়মিত তাঁদের খোঁজখবর নিতেন। নতুন যে কর্মীরা প্রেসের কাজে যুক্ত হচ্ছেন, রাজনৈতিক চেতনা ও দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করে উপযুক্ত ভাবে তাঁদের গড়ে তোলার কাজটি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে করে গেছেন তিনি।

২০ মে সকাল ছ'টা নাগাদ বারবার ডেকেও অর্ধচেতন কমরেড সলিল সেনের সাড়া না পাওয়ায় কমরেডরা অ্যাম্বুলেন্সে দ্রুত তাঁকে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে নিয়ে যান। সেখানে ডাক্তাররা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দলের কেন্দ্রীয় দফতরে মরদেহ আনা হলে দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ও কেন্দ্রীয় কমিটির উপস্থিত সদস্যরা সহ রাজ্য ও জেলা নেতৃবৃন্দ পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। নেতা-কর্মীদের উপস্থিতিতে কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

কমরেড সলিল সেন লাল সেলাম

মহান প্যারি কমিউনের ১৫০ বছর

‘মেহনতি জনগণের প্যারি কমিউন সর্বকালের এক নতুন সমাজের গৌরবোজ্জ্বল অগ্রদূত হিসাবে উদযাপিত হবে। কমিউনের শহিদদের মেহনতি জনগণ তাদের মহান হৃদয়ে সযত্নে স্থান দিয়েছে। ইতিহাস ইতিমধ্যেই কমিউন ধ্বংসকারীদের শূলদণ্ডে বিদ্ধ করেছে। ধর্মযাজকদের হাজার প্রার্থনাও সেই শূলযন্ত্রণা উপশমে বিন্দুমাত্র সাহায্য করতে পারবে না।’—কার্ল মার্কস

‘শুরুতেই কমিউন একটা কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। তা হল, শ্রমিক শ্রেণি ক্ষমতা দখল করে পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্র দিয়ে কাজ চালাতে পারবে না। সবেমাত্র অর্জিত প্রাধান্য যদি না হারাতে হয়, তবে শ্রমিক শ্রেণিকে তার বিরুদ্ধে পূর্বে ব্যবহৃত সমস্ত দমন যন্ত্রকে ধ্বংস করতে হবে, অন্য দিকে তার নিজের ডেপুটিদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। এ কথা ঘোষণা করতে হবে,— তাদের যে কোনও মুহূর্তে ফিরিয়ে আনা (রিকল) হতে পারে। এর অন্যথা হতে পারে না।’—ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস

দুনিয়ার প্রথম শ্রমিক অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়েছিল ১৮৭১ সালের মার্চ মাসে। প্যারিসের শ্রমিকরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শ্রমিক শ্রেণির সরকার ‘প্যারি কমিউন’। ফরাসি শাসক শ্রেণি সেদিন এই অভ্যুত্থান দমন করতে রক্তের স্রোত বইয়ে দিয়েছিল। সরকারি মতেই কমপক্ষে ৬ হাজার শ্রমিককে হত্যা করা হয়েছিল। বেসরকারি মতে তা আরও কয়েক গুণ বেশি। ১৮ মার্চ থেকে ২৮ মে এই স্বল্পস্থায়ী ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণি অর্জন করেছিল বিপুল অভিজ্ঞতার সম্ভার। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দিশারি মহান কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস এই আপাত ব্যর্থ অভ্যুত্থানের থেকে প্রাপ্ত শ্রমিক শ্রেণির প্রয়োজনীয় শিক্ষাকে তুলে ধরেছিলেন অসাধারণ প্রজ্ঞায়। সেই প্যারি কমিউনের ১৫০ বছর এই ২০২১ সালের ২৮ মে। সেই উপলক্ষে গণদাবীর আগামী সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হবে প্যারি কমিউন সংক্রান্ত ধরাবাহিক একটি লেখা।

স্বরূপনগরে বি এম ও এইচ ডেপুটেশন

ভিড় এড়াতে ব্লকের প্রতিটি পি এইচ সি-তে কোভিড টেস্টের নমুনা সংগ্রহ, টিকাকরণ, অক্সিজেন, চিকিৎসার ব্যবস্থাপনা, কোভিড জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি এবং গ্রামীণ চিকিৎসক সংগঠন পি এম পি এ আই। পঙ্কজ মল্লিক ও সুশান্ত ঘোষের নেতৃত্বে আট জনের

হাসপাতাল-সেফ হোম চালু, চিকিৎসা কাজে গ্রামীণ চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে নিয়োগ সহ নানা দাবিতে ১১ মে শাড়াপুল গ্রামীণ হাসপাতালে স্বরূপনগর বি এম ও এইচ-কে যৌথভাবে ডেপুটেশন দিল হাসপাতাল ও প্রতিনিধি দল বিএমওএইচ-এর হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন। তিনি দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে সেগুলি রূপায়ণের আশ্বাস দেন এবং ইতিমধ্যেই কয়েকটি ক্ষেত্রে কাজও শুরু করে দিয়েছেন।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও অফিস সম্পাদক কমরেড নুরসেদ আলী করোনা পরবর্তী নানা শারীরিক জটিলতার কারণে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে ১৯ মে বিকালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ পৌঁছতেই গোটা মুর্শিদাবাদ জেলায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। ২০ মে কলকাতাতেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। ওই দিন কমরেড আলীর মরদেহে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পূর্বতন মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক কমরেড স্বপন ঘোষাল এবং বর্তমান জেলা সম্পাদক ও রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সাধন রায়ের পক্ষেও মাল্যদান করা হয়। প্রয়াত কমরেডের ঘনিষ্ঠ কমরেডরা সহ দলের গীতাঞ্জলি প্রিন্টিং প্রেস ও জেলা পার্টি অফিসের পক্ষে মাল্যদান করা হয়। এছাড়াও চিকিৎসক, নার্স এবং দলের অন্যান্য নেতা-কর্মীরা মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

ভগবানগোলা ব্লকের জালি বাগিচা গ্রামের প্রান্তিক কৃষক পরিবারের সন্তান কমরেড নুরসেদ আলী ছাত্র জীবনের প্রথম দিকে সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই-এর সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৩ সালে মুর্শিদাবাদ জেলা জুড়ে এস ইউ সি আই (সি)-র উপর সিপিএমের আক্রমণের ঘটনায় তাঁর মনে বিভিন্ন প্রশ্ন জাগে। এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তিনি এআইডিএসও এবং পার্টির নেতাদের কাছে ছুটে যান। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এস ইউ সি আই (সি) দলের উন্নত রুচি-সংস্কৃতির মান তাঁকে আকৃষ্ট করে। তিনি দলের কাজ শুরু করেন। এই সময় জেলার শ্রীপৎ সিং কলেজে ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। বিশেষ করে ১৯৭৮ সালে সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকারের প্রাথমিকে ইংরেজি ও পাশফেল তুলে দেওয়ার প্রতিবাদ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। সেই সময়ই জেলায় বন্যার্ত মানুষের জন্য ত্রাণকার্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন তিনি।

১৯৮৫ সালে দলের প্রয়োজনে গ্রাম থেকে বহরমপুর শহরে জেলা অফিসে আসেন এবং সেই থেকেই কমরেড আলী জেলা প্রেসের কাজ দেখাশোনা শুরু করেন। বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ক্রমাগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এ কাজে দক্ষ হয়ে ওঠেন। সে সময় দলের আর্থিক সঙ্গতি ছিল খুবই সামান্য। ফলে প্রেস এবং অফিসের কর্মীদের নানা সমস্যায় পড়তে হত। তার মধ্যেও মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের যে আদর্শ মনুষ্যত্বের প্রদীপ জ্বালায়, চরিত্রকে বিকশিত করে, সেই সংগ্রামী ধারায় নিজেকে বিকশিত করে গড়ে তোলার চেষ্টা শুরু করেন। যৌথ জীবন পরিচালনার সংগ্রামেই পরিবারের সদস্যদেরও তিনি দলের সাথে যুক্ত করেছেন। তাঁর পরিবারের সকলেই দলের কর্মী। ‘দলই জীবন’ এই লক্ষ্যে তিনি আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন।

১৯৮৮ সালে প্রথম পার্টি কংগ্রেসে তিনি প্রতিনিধি হিসাবে অংশ নেন। দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী, পূর্বতন জেলা সম্পাদক প্রয়াত নেতা কমরেড প্রাণগৌর বসাক সহ নেতৃবৃন্দের সাহচর্য তাঁর বিকাশে সাহায্য করেছিল। নিজেকে ত্রুটিমুক্ত করা ও ক্রমাগত বিকশিত হওয়ার জন্য দলের আভ্যন্তরীণ সংগ্রামকে তিনি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন। দলের দেওয়া জেলা অফিসের কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব শুধু নয়, তাঁকে দল যখন যে দায়িত্ব দিয়েছে তা হাসিমুখে হৃদয় দিয়ে পালন করেছেন। প্রেস এবং অফিসের নীরস আপাত কঠিন নিরানন্দময় কাজের মধ্যেও বিপ্লবী জীবনের আনন্দ তাঁর চোখেমুখে ফুটে উঠত। তাঁর এই ভূমিকা এবং নিরলস সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি জেলা অফিসের ঘর থেকেই গোটা জেলার কমরেডদের অন্তঃস্থলে স্থান করে নিয়েছেন।

২০০৯ সালে জেলা সম্মেলনে তিনি দলের জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হন। ২০১৮ সালে তিনি দলের জেলা অফিস সম্পাদক নির্বাচিত হন। অফিসের কাজ পরিচালনা করার পাশাপাশি তিনি জেলার আরও বহু সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করতেন।

জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গণসংগঠন বা দলের নেতা-কর্মীরা জেলা অফিসে এলে তাদের বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজখবর নিতেন, কখনও সমালোচনাও করতেন। আবার ভালবেসে কাছে টেনে নিতেন। জুনিয়ার কমরেডদের গুণাবলিকে শ্রদ্ধাও করতেন প্রবল। এ সব কিছুর মধ্য দিয়ে তিনি আক্ষরিক অর্থেই গোটা জেলার অনেকেরই অভিভাবকে পরিণত হন। তাঁর প্রয়াণে মুর্শিদাবাদ জেলার গরিব খেটে খাওয়া মানুষ তাদের এক বিশিষ্ট সংগ্রামী আপনজনকে হারাল এবং দল হারাল একজন দক্ষ সংগঠক ও নেতাকে।

কমরেড নুরসেদ আলী লাল সেলাম

মুখ্যমন্ত্রী ও শ্রমমন্ত্রীকে ডেপুটেশন পরিচারিকা সমিতির

পরিচারিকা সহ সমস্ত অসংগঠিত কর্মহীন শ্রমিক পরিবারকে মাসিক ৭৫০০ টাকা আর্থিক সহায়তা, রেশন কার্ড না থাকলেও রেশনের মাধ্যমে এই পরিবারগুলির প্রত্যেক সদস্যকে প্রতি মাসে ১০ কেজি করে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ, অবিলম্বে বিনামূল্যে সবার জন্য করোনা ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করা, প্রয়োজন মতো হাসপাতালের বেড-অ্যাম্বুলেন্স-অক্সিজেন-ওষুধপত্রের ব্যবস্থা রাখা সহ ৯ দফা দাবিতে ২২ মে সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী এবং শ্রমমন্ত্রীকে অনলাইনে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সমিতির সভানেত্রী লিলি পাল এবং সম্পাদিকা পার্বতী পাল এই দাবিগুলির গুরুত্ব বিবেচনা করে অতি দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানান।

পাঠকের মতামত

সরকার কোথায়?

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে বেসামাল দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। চলছে মৃত্যুমিছিল, জ্বলছে গণচিতা, লাশ ভাসছে নদীর জলে। দেশে সরকার কোথায়?

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে ভারতেও করোনার দ্বিতীয় ঢেউ চলছে। প্রতিদিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রমিতের সংখ্যা। লম্বা হচ্ছে মৃত্যুমিছিল। মানুষ আজ বড় অসহায়। সংক্রমিত প্রিয়জনের জন্য অ্যাম্বুলেন্সটুকু জোগাড় করতে অনেককে সর্বস্ব খোয়াতে হচ্ছে— চিকিৎসা তো দূর অস্ত। হাসপাতালের বেডে এক মুমূর্ষর থেকে অক্সিজেন কেড়ে নিয়ে অন্য আরেকজন মুমূর্ষুকে বাঁচানোর চেষ্টাও চলছে অহরহ। অক্সিজেনের সঙ্কট আজ এতটাই যেখানে মুমূর্ষুদের মধ্যেও কে অক্সিজেন পাবে আর কে পাবে না, তা নিয়েও ট্রায়াজ সিস্টেম (যার বাঁচার সম্ভাবনা নেই তার থেকে চিকিৎসা কেড়ে নিয়ে যার বাঁচার সম্ভানা বেশি তাকে দেওয়া) চালু করতে হচ্ছে। অক্সিজেনের অভাব আজ মানবিকতার উপরও আঘাত হেনেছে। হাসপাতালে বেড না পেয়ে দিনের পর দিন বিনা চিকিৎসায় অনেকে তার প্রিয়জনকে ঘরে ফেলে রাখতে বাধ্য হচ্ছেন। চোখের উপর প্রিয়জনের দেহ নিথর হতে দেখে অনেকেই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছেন। রোগ নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষার ডেট পেতে হয়রানি হতে হচ্ছে অনেকেই। টেস্ট হলেও রিপোর্ট মিলছে পাঁচ-সাত দিন পরে। তত দিনে রোগীর নাভিশ্বাস উঠছে। অনেকেই রোগ নির্ণয়ের আগেই মারা যাচ্ছেন।

এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে অনেকেই বাঁচার তাগিদে ভ্যাক্সিন নিতে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ছেন। সকলকে ভ্যাক্সিন নিতে সরকার আবেদনও জানাচ্ছে। কিন্তু ভ্যাক্সিনের অভাবে মানুষ দিনের পর দিন ঘুরেও তা নিতে পারছে না। উপরন্তু চূড়ান্ত অব্যবস্থার জন্য ভ্যাক্সিনের লাইনে গাদাগাদি দাঁড়িয়ে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন অথবা অজানা করোনা রোগীর থেকে সংক্রমণ নিয়ে ঘরে ফিরছেন। করোনা চিকিৎসার জন্য মুষ্টিমেয় যে কয়েকটি ওষুধ রয়েছে, বেশিরভাগ সময়ে বাজারে তা অমিল। ওষুধ, অক্সিজেন, অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে, হাসপাতালের বেড পাওয়া নিয়ে খোলাখুলি ভাবেই কালোবাজারি চলছে। সরকার এবং প্রশাসন নির্বিকার। মনেই হবে না সরকার বলে কিছু দেশে আছে! দু'দিন আগেও ভোটবাজ দলগুলি ভোটের উন্মাদনা তৈরি করতে গিয়ে রোগটিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। তখন কিন্তু প্রশাসন ছিল এবং এই কাজে তারা সাহায্যই করেছে। কৃষকরা যখন মানুষের দাবি নিয়ে আন্দোলন করে, সে আন্দোলন ভাঙতে সরকার-প্রশাসন-পুলিশ-মিলিটারি সকলেরই অস্তিত্ব বোঝা যায়। এনআরসি বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য, শিক্ষার মতো মৌলিক অধিকার রক্ষার্থে মানুষ যখন আন্দোলনে নামে তখন দেখা যায় পুলিশ, মিলিটারি, র‍্যাফ কখনও লাঠি নিয়ে, কখনও জলকামান গোলা বন্দুক নিয়ে আন্দোলনকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সরকারের অস্তিত্ব মানুষ তখন কিন্তু হাড়ে হাড়েই টের পায়।

আর মানুষ যখন বিপর্যয়ের কবলে পড়ে, দুর্ভিক্ষ, মহামারির কবলে পড়ে খাদ্যহীন, বস্ত্রহীন, বাসস্থানহীন ও চিকিৎসাহীন হয়ে পড়ে তখনই কেবল সরকার ও প্রশাসনের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর পরে সৎকারের সময়ও সরকারের দেখা মেলে না। অস্তিত্ব মেলে কেবল গঙ্গার জলে দেহগুলি ভাসিয়ে দেওয়ার সময়।

গত শতাব্দীতেও মানুষ অনেক মহামারি দেখেছে। স্প্যানিস ফ্লু, প্লেগ, গুটিবসন্ত, কলেরা গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করে দিয়েছে। কোটি কোটি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। সে দিন এ সব রোগের চিকিৎসা ছিল অজানা। জীবাণু সংক্রান্ত জ্ঞান ছিল খুবই সীমিত। সামাজিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সেদিন গড়েও ওঠেনি। ফলে সেদিন মহামারির গতি ছিল অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু সেদিন মৃতদেহ গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়ার নজির ছিল কি না তা আমাদের জানা নেই। তবুও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালেও সরকারের অস্তিত্ব কিছুটা হলেও মানুষ সেদিন অনুভব করতে পারত। অন্তত রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে কোয়ারেন্টাইন প্রথা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল, তা শরৎসাহিত্যের বহু জায়গাতেই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু বতর্মানের অতিমারিতে সরকার কোথায়? আমাদের দেশের চিকিৎসকরা বৈজ্ঞানিকেরা প্রথম ঢেউয়ের পরে সরকারকে যখন বারে বারে সচেতন করেছে— দ্বিতীয় ঢেউ আসছে, ব্যবস্থা নিন। তখনও সরকারের অস্তিত্ব দেখা যায়নি। দেশ জুড়ে ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক জমায়েতের অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু সরকারের অস্তিত্ব ছিল।

আজ জীবাণু বিজ্ঞান থেকে, জনস্বাস্থ্য বিজ্ঞানের জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের কাছে রয়েছে। কন্টেনমেন্ট মেজার্স, দ্রুত রোগনির্ণয়, আইসোলেশন, চিকিৎসা, যে অতিমারি নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে, তা তো আমাদের জানাই ছিল। তা-ও এর কোনও কিছুই প্রায় আমাদের দেশে প্রয়োগই করা হল না। আসলে তা প্রয়োগ করার মত উপযোগী স্বাস্থ্যনীতি, স্বাস্থ্যবাজেট, সরকারি সদিচ্ছা এবং জনগণের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা, সর্বোপরি সেই স্বাস্থ্য পরিকাঠামো— এর কোনওটাই এ-দেশে নেই, গড়ে তোলা হয়নি। তাই তো আমরা দেখতে পাই কিউবা, ভিয়েতনামের মত গুটিকয়েক দেশ করোনাকে আজ রুখে দিতে পেরেছে। কারণ সেখানে উপস্থিত রয়েছে জনমুখী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, পরিকাঠামো, মানুষের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা, ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গির বদলে বিজ্ঞানভিত্তিক ও জনমুখী স্বাস্থ্যনীতি প্রয়োগের মাধ্যমে। বিশ্বের সর্বশক্তিমান দেশ আমেরিকা, জার্মান, ব্রিটেন কিন্তু তা পারল না। কারণ সেসব দেশে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়বরাদ্দ বেশি থাকলেও, তার বেশিরভাগ অংশই খরচ হয় বিমা কোম্পানির টাকা মেটাতে। পুরোপুরি ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে চলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় একটা বড় অংশই খরচ হয়ে যায় ঝাঁ চকচকে টার্শিয়ারি ব্যবস্থা নির্ভর স্বাস্থ্যব্যবস্থার ঠাটবাট বজায় রাখতে। জনস্বাস্থ্যের গুরুত্ব সেখানে কোথায়? তাই বনেদি পুঁজিবাদী দেশ হয়েও তারা করোনা সামলাতে ধরাশায়ী হয়ে যায়।

আমাদের দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থাও গত তিন দশক ধরে ওই একই খাতে বয়ে চলেছে। বিশ্বের মধ্যে সর্বনিম্ন স্বাস্থ্য বাজেটের এই দেশের ন্যূনতম এই ব্যয়বরাদ্দও চালান হয়ে যায় কর্পোরেটমুখী স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে। জনস্বাস্থ্য সেখানে ভীষণ ভাবে লঙ্ঘিত। অতিমারি রোখার পরিকাঠামো এ দেশে কখনও গড়েই তোলা হয়নি। সুযোগ বুঝে সরকারও নির্বিকার। ফলে এ দেশে প্রতিরোধহীন, নিয়ন্ত্রণহীন ভাবে করোনা গ্রাস করে চলেছে এ দেশের আপামর জনগণকে। অসহায় মানুষ বানের জলে ভেসে যেতে যেতে খড়কুটো ধরে বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার করোনা মোকাবিলার নাম করে কখনও সম্পূর্ণ কখনও আংশিক ভাবে লকডাউন ঘোষণা করে দায় সারার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ অপরিকল্পিত লকডাউনের জেরে মানুষের সীমাহীন ভোগান্তি নিবারণে ন্যূনতম চেষ্টায়ও সরকারের অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে না। পরিযায়ী শ্রমিকরা হাজার হাজার মাইল হেঁটে বাড়ি ফেরার পথে তাই অনেকেই প্রাণ হারান। কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষ কাজ হারায়, না খেতে পেয়ে মরে। লকডাউনের বাড়াবাড়িতে চিকিৎসার সুযোগ না পেয়ে অনেকেই মরে। তখন কিন্তু দেশের কোথাও সরকার আছে বলে মনেই হয় না।

ডাঃ সজল বিশ্বাস
সাধারণ সম্পাদক, সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির সদস্য কমরেড জগন্নাথ দাস করোনায় আক্রান্ত হয়ে ১৮ মে রাত্রে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

মেদিনীপুর কলেজে পাঠরত অবস্থায় ১৯৭৬ সালে তিনি ওই কলেজে ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র সংস্পর্শে এসে মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত হন। জরুরি অবস্থার মধ্যে ওই কলেজের অভ্যন্তরে ডিএসও-র উপর ছাত্র পরিষদ আক্রমণ চালায়। ১৯৭৭-এর পরে রাজ্যে সিপিএম ক্ষমতায় এলে এসএফআই-এর আক্রমণ সে সময় ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কমরেড জগন্নাথ দাস বহুবার সেই আক্রমণের শিকার হয়েছেন। পারিবারিক আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে মেদিনীপুর শহরে একটি ব্যায়ামাগারের মধ্যে একটি ছোট্ট আশ্রয়স্থলে দরিদ্র পরিবারের কয়েকজন বন্ধুর সাথে থেকে অতি কষ্টে তিনি পড়াশোনা চালিয়েছেন। মেদিনীপুর কলেজে পড়াকালীনই তাঁর জন্মস্থান সবং থানায় এআইডিএসও-র পাশাপাশি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার কাজ তিনি শুরু করেন।

পরিবারের আর্থিক প্রয়োজন ও চাপে মিলিটারির চাকরিতে চলে যান। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর মনে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। একদিকে দেশের মানুষের অসহায় অবস্থা, অন্য দিকে মিলিটারির জন্য বিপুল ব্যয় ও সেই বাহিনীর ভূমিকা ও কার্যকলাপ তাঁর মনে প্রশ্ন তোলে। ফলে দু-তিন মাসের মধ্যেই চাকরি ছেড়ে তিনি সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সেই সময় সবং থানার অন্য অংশে কমরেড ভূষণ চন্দ্র মণ্ডলের নেতৃত্বে পার্টি সংগঠনের কাজে যুক্ত হয়ে নানা গণআন্দোলনে তিনি ভূমিকা নেন। ১৯৭৮-এর বিধ্বংসী বন্যায় কেলেঘাই নদীর দু'ধারে অবস্থিত সবং, নারায়ণগড়, ভগবানপুর, পটাশপুর প্রভৃতি ব্লক কার্যত ধ্বংস হয়ে গেলে পার্টির নেতৃত্বে উদ্ধারকাজ, ত্রাণ সরবরাহ ইত্যাদি কাজে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নেন। পরবর্তীকালে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাপক জনগণকে যুক্ত করে কেলেঘাই, কপালেশ্বরী, বাঘাই নদী সংস্কারের দাবিতে গণকমিটির নেতৃত্বে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন সফল পরিণতিতে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেছিলেন। ভাষা শিক্ষা আন্দোলন, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়কে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার ছাত্রদের জন্য কেবলমাত্র বৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান করার সরকারি পরিকল্পনা বন্ধ এবং মৌলিক বিষয়গুলি চালু করার দাবিতে গঠিত শিক্ষার সম্প্রসারণ কমিটির নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলনে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। বাসভাড়া বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন এবং এলাকায় সারের কালোবাজারি বন্ধ, রাস্তাঘাট, পানীয় জল, সেচ ব্যবস্থা, ধানের ন্যায্য দাম প্রভৃতি বহুবিধ দাবিতে আন্দোলনে তিনি সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯৮৮ সালে প্রথম পার্টি কংগ্রেসের প্রাক্কালে '৮৭ সালে তিনি সবং লোকাল কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন।

পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত সামান্য জমিটুকু বিক্রি করে সেই অর্থ দিয়ে তিনি সবং থানার কেন্দ্রস্থল তেমাথানিতে পার্টি অফিস তৈরির জন্য জমি কিনে দিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত অর্থ, সম্পত্তি বলতে তাঁর আর কিছুই ছিল না। সর্বক্ষণই দলের কার্যক্রমের মধ্যে তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রাখতেন।

'৯০-এর দশকের গোড়ায় বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলন গড়ে ওঠার পরে তিনি সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি (অ্যাবেকা)-র সাথে যুক্ত হয়ে এলাকার তৎকালীন বিদ্যুৎ ব্যবস্থার দুর্দশা দূর করবার জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং থানা জুড়ে তাঁর নেতৃত্বে শক্তিশালী সংগঠন গড়ে উঠে। তিনি অ্যাবেকার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক হিসাবে বিস্তীর্ণ জেলা জুড়ে ব্লকে ব্লকে শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলেন এবং আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। বিদ্যুৎ আন্দোলনে রাজ্যস্তরেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গেছেন। উপরোক্ত আন্দোলনগুলিতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ব্যক্তি ধরে ধরে দলের আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা, মুখপত্রের গ্রাহক ও ডোনার করানো ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তাঁদের বিপ্লবী দলের প্রতি আকৃষ্ট করেছেন।

কোনও বিষয়ে সমালোচিত হলে, কখনও দুঃখ পেলেও পাল্টা জবাব তিনি দিতেন না। ছোটদের গুণ দেখলে তাদের বরাবরই উৎসাহিত করতেন।

তাঁর অকালমৃত্যুতে দল হারাল একজন নিষ্ঠাবান সংগঠককে। রাজ্যের বিদ্যুৎ গ্রাহকরা এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সাধারণ মানুষ হারাল তাঁদের জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে গড়ে ওঠা আন্দোলনের পরীক্ষিত একজন সংগঠককে।

কমরেড জগন্নাথ দাস লাল সেলাম

কৃষক আন্দোলনে মোদি সরকারের বর্বর আচরণের প্রতিবাদে কালা দিবস পালিত

এসইউসিআই(সি) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২৬ মে এক বিবৃতিতে বলেন, কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি পরিচালিত বিজেপি সরকারের সর্বনাশা কৃষি আইন ও বিদ্যুৎ নীতির বিরুদ্ধেগত বছরের ২৬ নভেম্বর থেকে দূর-দূরান্তের লক্ষ লক্ষ কৃষক মরণপণ সংগ্রামে দিল্লির রাজপথে অবস্থান করছেন। আজ তার ৬ মাস পূর্ণ হল। ইতিমধ্যে প্রায় ৫০০ কৃষক এই আন্দোলনে শহিদের মৃত্যু বরণ করেছেন। অথচ কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার চূড়ান্ত উদাসীনই শুধু নয়, ফ্যাসিস্ট মানসিকতায় যে কোনও উপায়ে কৃষকদের এই আন্দোলন ভেঙে দেওয়ার বহু চেষ্টা করেছে। নরেন্দ্র মোদি সরকারের এই কৃষকস্বার্থ বিরোধী আচরণ এবং বিজেপি সরকারের সাত বছরের চূড়ান্ত জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আজ ২৬ মে সারা ভারতে কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-যুব-মহিলা সমস্ত অংশের অংশের মানুষ 'কালা দিবস' পালন করেছেন। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে এই কৃষি আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায় কৃষকদের ঘরে ঘরে 'কালা দিবস' পালন করে কালো পতাকা তোলা হয়েছে, নরেন্দ্র মোদির কুশপুতুল দাহ করা হয়েছে এবং দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে মাল্যদান করে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলনকে আরও ব্যাপকভাবে সংগঠিত করার অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে।

অনাহারে চটশিল্পের লক্ষাধিক শ্রমিক পরিবার, সরকার উদাসীন

পশ্চিমবঙ্গের শতাব্দী প্রাচীন শ্রমনিবিড় চটশিল্পের ১৬টি মিল আজ 'সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক'-এর ফলে বন্ধ হয়ে রয়েছে। কর্মহীন হয়ে পড়েছেন প্রায় লক্ষাধিক শ্রমিক। করোনা অতিমারির দ্বিতীয় ঢেউয়ে যখন লকডাউনের মতো বিধিনিষেধে জনজীবন স্তব্ধ, সাধারণ মানুষ গৃহবন্দি, তখন একের পর এক জুটমিল বন্ধ হচ্ছে। মিল মালিকরা কাঁচা পাটের অভাবের অজুহাত দেখিয়ে মিল বন্ধ করে দিচ্ছে। এর জন্য সরকার অথবা শ্রমিক সংগঠনগুলির সাথে কোনও আলোচনাও করছে না। চাল, গম, ডাল ইত্যাদি খাদ্যশস্য সংরক্ষণের জন্য চটের বস্তা অত্যাবশ্যকীয় পণ্য হিসাবে গণ্য হয়। সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী ৩০ শতাংশ শ্রমিক নিয়ে জুটমিল লকডাউনেও চালু থাকার কথা। পরবর্তী সময় শ্রমিক সংখ্যা বাড়িয়ে ৪০ শতাংশ করেছে সরকার। এ ক্ষেত্রে ৩০ বা ৪০ শতাংশ উৎপাদন ক্ষমতা নিয়ে চলার ক্ষেত্রে তথাকথিত কাঁচা পাটের অভাবের অজুহাত টেকে না। কারণ এর জন্য মিল চালু রাখতে পূর্ণ ক্ষমতার ৩০ বা ৪০ শতাংশ কাঁচা পাট সরবরাহই যথেষ্ট।

একথা ঠিক ভারতে কাঁচা পাটের উৎপাদন গত বছর অবশ্যই কম হয়েছে। এর জন্য দায়ী কিন্তু সরকারি নীতি। চট শিল্পের সাথে যুক্ত দেশের ৪০ লক্ষ পাটচাষি পরিবার সরকারি সংস্থা অথবা বেসরকারি ফড়েদের কাছ থেকে ন্যায্যমূল্য পায় না বলেই তারা পাট চাষে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বস্ত্রমন্ত্রকের অধিন জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার দায়িত্বে রয়েছে কাঁচা পাটের উৎপাদন প্রয়োজন মতো বাড়ানো, নিয়ন্ত্রণ এবং বন্টন করা। কিন্তু বিশ্বায়নের নীতির অনুসারী সরকার বেসরকারি ব্যবসায়ী এবং ফাটকাবাজদের হাতেই কাঁচা পাটের মজুত এবং নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিয়েছে। তাই অত্যাবশ্যকীয় পণ্য হলেও কাঁচা পাট আজ খোলা বাজারে কালোবাজারি এবং মজুতদারির কবলে। আজ মালিকরা কাঁচা পাট নেই বলে শোরগোল তুলছে, এটাকেই মিল বন্ধের অজুহাত করছে। অথচ বেশি টাকা দিয়ে খোলাবাজারে পাট পাওয়া যাচ্ছে কেন? তা ছাড়া সব মিলের ক্ষেত্রে এই অজুহাতটাও তো খাটছে না! কারণ, বন্ধ মিলগুলির মধ্যে প্রায় চার-পাঁচটা জুটমিল বহুদিন যাবৎ অন্য কারণে বন্ধ রয়েছে। মালিকরা কাঁচা পাটের অভাবের কথা মিল বন্ধের নোটিশে উল্লেখ করলেও তারা একই সাথে শ্রমিক ছাঁটাই, শ্রমিকদের ওপর কাজের বোঝা চাপানো, কাজগুলি কন্ট্রাক্টে দেওয়া ইত্যাদি নানা বেআইনি শর্ত চাপানোর কথা বলছে। এতেই তাদের আসল অসাধু উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে যায় না কি!

কাঁচা পাটের সঙ্কট থাকলে কেন্দ্রীয় সরকার তা অন্য দেশ থেকে আমদানি করার ব্যবস্থা করুক। এ দায়িত্ব তো তাদেরই! অন্যদিকে শ্রমিকের স্বার্থ দেখার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের উপর বর্তায়। পাট শিল্পের সংকট মেটাতে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন এবং হস্তক্ষেপ কোনও সরকার করছে না। দুই সরকারই উদাসীন। ফলে বাড়ছে জুট শ্রমিকদের জীবনের ভয়ানক সঙ্কট। চটশিল্পের প্রায় ৪০ শতাংশ শ্রমিকই প্রায় পরিযায়ী শ্রমিক। এঁরা বিহার, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা বা পশ্চিমবঙ্গের দূরবর্তী জেলা থেকে হুগলি নদীর দুইপারের মিলগুলিতে কাজ করতে আসেন। লকডাউন পরিস্থিতিতে তাঁরা পরিবহণের অভাবে ফিরে যেতেও পারছেন না। রোজগারহীন অবস্থায় তাঁরা দুর্বিষহ অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছেন। সরকার প্রথমে ৩০ শতাংশ তারপর ৪০ শতাংশ শ্রমিক নিয়ে মিল চালাতে বলেছে। কিন্তু বাকি ৬০-৭০ শতাংশ শ্রমিক কী করে দিন চালাবেন? রোজগারহীন হয়ে পড়া এই শ্রমিকদের নিয়ে সরকারের কোনও পরিকল্পনা বা নির্দেশ নেই। এর প্রতিবাদ করেছে এআইইউটিইউসি সহ শ্রমিক ইউনিয়নগুলি।

এই পরিস্থিতিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস এবং এআইইউটিইউসি অনুমোদিত বেঙ্গল জুটমিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড অমল সেন রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ চেয়ে বন্ধ হওয়া মিলগুলি অবিলম্বে খোলার দাবিতে চিঠি দিয়েছেন। রোজগারহীন শ্রমিকদের মাসিক ৭,৫০০ টাকা করে অনুদান এবং বিনামূল্যে মাথাপিছু ১০ কেজি করে চাল, আটা ইত্যাদি রেশন দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

অবিলম্বে হুগলি জুটমিল খোলার দাবি

হঠাৎ করে গার্ডেনরিচের হুগলি জুটমিল বন্ধ করে দেওয়ার বিরুদ্ধে এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস ২৯ মে এক বিবৃতিতে বলেন, বিনা নোটিশে অন্যায় অজুহাত তুলে হঠাৎ করে হুগলি জুটমিল বন্ধ করে দিয়েছে তার মালিক। এর ফলে দু'হাজারেরও বেশি শ্রমিক কাজ হারালেন। এ অবস্থায় আমরা মালিক ও সরকারের কাছে দাবি করছি— কোনও অজুহাত না দেখিয়ে অবিলম্বে হুগলি জুটমিল খোলার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সকল শ্রমিককে কাজে যোগদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনে সরকারকে এখনই ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

জীবনাবসান

কলকাতায় দলের তারাতলা লোকাল কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক কমরেড উপেন্দ্র ভক্ত করোনায় আক্রান্ত হয়ে ১১ মে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

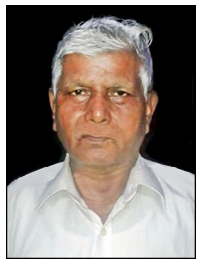

তারাতলা সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় শিক্ষা আন্দোলন, গরিব মানুষের নানা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি বহুজনের প্রিয় মাস্টারজি হিসাবে শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। ১৯৮০ সালে দলের তৎকালীন জেলা সম্পাদক ও পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জীর নির্দেশে বর্তমানে দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড শিলাজিৎ সান্যাল পোর্ট ও তারাতলা এলাকায় সংগঠনের কাজ শুরু করেন। সেই সময় প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ও পাশ-ফেল প্রথা পুনঃপ্রবর্তনের দাবিতে সারা রাজ্য জুড়ে আন্দোলন গড়ে উঠছিল। এই আন্দোলনের মাধ্যমেই কমরেড উপেন্দ্র ভক্তের সাথে দলের যোগাযোগ গড়ে ওঠে। তিনি এই আন্দোলনে নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেন। এই আন্দোলনের প্রয়োজনেই দলের নির্দেশে তিনি তাঁর পুরনো স্কুল খিদিরপুরের হরিজন জ্ঞানপ্রকাশ বিদ্যালয় থেকে তারাতলায় হরিজন জ্ঞানমন্দিরে বদলি হয়ে আসেন। এই সময়ে তিনি প্রাথমিক শিক্ষকদের সংগঠন বিপিটিএ-র সাথে যুক্ত হন এবং সংগঠনের বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

শুরু থেকেই কমরেড ভক্ত দলের বিস্তারের কাজে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন। পোর্ট এলাকায় একেবারে গরিব মজুর, ঝুপড়িবাসী, নিপীড়িত মানুষকে সংগঠিত করে নারীনিগ্রহ ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধেআন্দোলন শুরু করেন। পোর্ট অথরিটি যখন ঝুপড়ি উচ্ছেদের উদ্যোগ নেয়, তার বিরুদ্ধে গরিব মানুষকে সংগঠিত করে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলেন। ফলে তিনি একদিকে যেমন গরিব মানুষের আপনজন হয়ে ওঠেন, অন্য দিকে কায়েমি স্বার্থের শত্রু হয়ে পড়েন। ভীতি প্রদর্শন, এমনকি জীবননাশের হুমকিও আসে। কিন্তু কোনও কিছুই তাঁকে আন্দোলন থেকে নিরস্ত করতে পারেনি। তাঁর এই সাহসী ও নেতৃত্বকারী ভূমিকার জন্য বাস্তবে তিনি পোর্ট এলাকায় জননেতায় রূপান্তরিত হয়েছিলেন। শুধু বাইরের মানুষকে যুক্ত করেছেন তাই নয়, তিনি তাঁর স্ত্রী, কন্যা এবং পুত্রদের দলের সাথে যুক্ত করেন। আজ তাঁরা প্রত্যেকেই দলের গুরুত্বপূর্ণ কর্মী ও সংগঠক। তিনি তাঁর আত্মীয়স্বজনদের মধ্য থেকেও অনেককে দলের সাথে যুক্ত করতে সক্ষম হন। ছেলেমেয়েরা যখন ছোট, আয়ের উৎস সীমিত, সাংসারিক অভাব-অনটন রয়েছে, তখনও সবসময়ই তিনি পার্টির দায়িত্বকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। পরবর্তীকালে পার্টি নেতৃত্ব যখন তাঁকে মহেশতলায় পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার নির্দেশ দেন, তখন অকেজো শরীর নিয়েও সেখানে সংগঠন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি দলের চিন্তা ও কাজের মধ্যেই নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন।

তাঁর চরিত্রের একটা বড় বৈশিষ্ট্য ছিল প্রকৃত উদার মন। সমস্ত জুনিয়র কমরেডদের সন্তানস্নেহে দেখতেন। তাঁর বাড়িতে সকলেরই ছিল অবাধ যাতায়াত। যারাই তাঁর কাছে আসত, তাদের সবসময় পার্টির প্রয়োজন ও তাৎপর্যের কথা বলতেন। দীর্ঘ পার্টি জীবনে আমৃত্যু পার্টির প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য প্রদর্শন করে গেছেন। নেতৃত্বের কঠোর সমালোচনাকেও তিনি হাসিমুখে গ্রহণ করতে পারতেন। পরিবারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে দলের নেতৃত্বের কথাই ছিল শেষ কথা। তিনি তাঁর বাড়িকে পার্টি সেন্টার হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে পার্টি হিন্দিভাষী অঞ্চলের একজন যথার্থ জননেতা এবং পরীক্ষিত সৈনিককে হারাল। পোর্ট এলাকা ও মহেশতলায় যে শূন্যতা তৈরি হল তা সহজে পূরণ হওয়ার নয়।

কমরেড উপেন্দ্র ভক্ত লাল সেলাম

আরও পদ বিলোপ করছে রেল

প্রতিবাদ এ আই ইউ টি ইউ সি-র

করোনা মহামারির মধ্যে যখন শুধু মে মাসেই কোটির উপর মানুষ কাজ হারিয়েছেন বলে সরকারি সূত্রই স্বীকার করছে, সেই সময় আরও পদ বিলোপ করে কর্মী সঙ্কোচনের জনবিরোধী পথ নিল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন ভারতীয় রেল কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি প্রকাশিত সংবাদে দেখা গেছে রেল বোর্ড নতুন করে ১৩ হাজার ৪৫০টি পদ নতুন করে বিলোপ করার ব্যবস্থা করেছে। শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত ৩০ মে এক বিবৃতিতে এর তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন, এই পদক্ষেপ একাধারে শ্রমিক বিরোধী এবং চূড়ান্ত জনবিরোধী।

১৯৭৪ সালে রেলের কর্মীসংখ্যা ছিল ২২ লক্ষ। তারপর থেকে সারা দেশেই রেলের অসংখ্য নতুন লাইন বেড়েছে, যাত্রী এবং মালবাহী ট্রেন বেড়েছে কয়েকগুণ। কিন্তু কর্মীসংখ্যা সঙ্কুচিত হতে হতে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১২ লক্ষে। প্রতি বছরই রেলে কর্মসঙ্কোচন নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিনের রেল চলাচলের সাথে সরাসরি যুক্ত রানিং স্টাফ ছাড়াও রেলের সর্বস্তরের কর্মী সংখ্যা ক্রমাগত কমছে।

সম্প্রতি বিপুল কাজের বোঝা মাথায় নিয়ে বিশেষ ট্রেন, অক্সিজেন এক্সপ্রেস ইত্যাদি চালু রাখতে গিয়ে ২ লক্ষ ৩০ হাজার রেল কর্মচারী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন, প্রাণ হারিয়েছেন প্রায় ২৫০০ জন কর্মী। অথচ রেলে যে উন্নত স্বাস্থ্যব্যবস্থা ছিল ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীর অভাবে তাও দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই কর্মী সঙ্কোচন রেলের কর্মচারীদের স্বার্থকে আঘাত করেছে শুধু নয়, সাধারণ মানুষের রেল যাত্রাকেও বিপজ্জনক করে তুলেছে।

কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত এই জনবিরোধী সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে এর বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য রেল কর্মচারী এবং জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন।

করোনা মোকাবিলায় যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে কলকাতার সমস্ত বরোতে ডেপুটেশন

৩ নম্বর বরো অফিসে ডেপুটেশন

সোনারপুর বিডিও এবং স্বাস্থ্য আধিকারিককে স্মারকলিপি

কোভিড পরিস্থিতিতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মানুষের পাশে সরকার এবং প্রশাসনকে অবিলম্বে দাঁড়ানোর আবেদন জানিয়ে কলকাতায় দলের আঞ্চলিক কমিটিগুলির পক্ষ থেকে সমস্ত বরোতে কোথাও অনলাইনে কোথাও সরাসরি দেখা করে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। প্রতিটি ওয়ার্ডে এবং পঞ্চায়েত এলাকায় সেফহোম গড়ে তোলা, ইমারজেন্সি রোগীদের জন্য আইসোলেশন ওয়ার্ড চালু করা, প্রতিটি এলাকায় অস্থায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তুলে বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দেওয়ার ব্যবস্থা করা, করোনা রোগীকে প্রয়োজনীয় ওষুধ ও অক্সিজেন সরবরাহ সহ আট দফা দাবিপত্র পেশ করা হয়।

২১ মে দলের বেলেঘাটা ও উল্টোডাঙা-মানিকতলা লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে ফুলবাগানে কলকাতা পুরসভার ৩ বরো অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ২০ মে দলের সোনারপুর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে স্থানীয় বিডিও এবং স্বাস্থ্য আধিকারিককে স্মারকলিপি দেওয়া হয় এবং দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিডিও দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দেন।

১৫ নম্বর বরো অফিসে ডেপুটেশন

মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ঘোষণার দাবি

মুখ্যমন্ত্রী জুলাই এবং আগস্ট মাসে উচ্চমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে বলে ঘোষণা করলেও সুনির্দিষ্ট তারিখ এবং সামগ্রিক পরিকল্পনা এখনও জানানো হয়নি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে এ আই ডি এস ও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক ২৮ মে এক বিবৃতিতে বলেন, শুধু আমলাদের উপর নির্ভর না করে রাজ্য সরকারের উচিত ছিল এ বিষয়ে শিক্ষাবিদ, শিক্ষক এবং ছাত্র সংগঠনগুলির মত নেওয়া।

তিনি দাবি করেছেন, বিস্তৃত পরিকল্পনা, প্রশ্নের ধরন ইত্যাদি খুঁটিনাটি অবিলম্বে জানাতে হবে। ইয়াস দুর্গত এলাকার পরীক্ষার্থীদের জন্য অবিলম্বে শিক্ষা সামগ্রীর ব্যবস্থা করতে হবে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পরীক্ষার্থীদের থাকা-খাওয়া ও পড়াশোনার ব্যবস্থা সরকারি তত্ত্বাবধানে করতে হবে। সংগঠন দাবি করেছে, পরীক্ষার্থীদের সুরক্ষার দিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

হোম সেন্টারে পরীক্ষার স্বচ্ছতা রক্ষার জন্য পার্শ্ববর্তী স্কুলের শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা গ্রহণ, সরকারি ব্যবস্থাতে উপযুক্ত পরিবহণের দাবি জানিয়েছে এআইডিএসও।

জীবনাবসান

উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় এস ইউ সি আই (সি) দলের ভাটপাড়া জগদ্দল লোকাল কমিটির প্রবীণ সদস্য, মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রাক্তন রাজ্য সহসভাপতি এবং শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক কমরেড ইন্দ্রানী হালদার ১৭ মে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তিনি দীর্ঘ দিন অসুস্থ ছিলেন, করোনা সংক্রমণের কারণে তাঁকে বারাকপুরের নার্সিং হোমে ভর্তি করেও জীবন রক্ষা করা যায়নি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তাঁর মৃত্যুসংবাদে জেলায় দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও শোকের ছায়া নেমে আসে।

জেলায় দলের সূচনাপর্বে কমরেড ইন্দ্রানী হালদার ১৯৫৭ সালে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র গার্লস কলেজে পাঠরত অবস্থায় ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র সংস্পর্শে এসে ছাত্র আন্দোলনে যোগ দেন। ওই বছরই দেশের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে দলের প্রার্থী হিসাবে কমরেড অসিত রায় ভাটপাড়া কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তিনি ছিলেন কমরেড ইন্দ্রানী হালদারের মামাতো দাদা। কমরেড ইন্দ্রানী হালদার নির্বাচনে প্রচারের কাজ করতে শুরু করেন এবং দলের কর্মী হয়ে ওঠেন। সে সময় কিছুদিন কেন্দ্রীয় কমিটির প্রয়াত সদস্য কমরেড তাপস দত্ত ভাটপাড়ায় ছিলেন। দলের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষও তখন ছাত্র সংগঠনের কাজ দেখাশোনার জন্য ভাটপাড়ায় যেতেন। তাঁদের সাহচর্যে কমরেড ইন্দ্রানী হালদার এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সান্নিধ্যে আসেন। এর মধ্য দিয়ে কমরেড হালদার দলের একনিষ্ঠ, উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন, সাহসী এবং প্রত্যয়ী কর্মী হিসাবে গড়ে ওঠেন। ভাটপাড়ার অতি রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে হয়েও তিনি দলের একজন সক্রিয় কর্মী হিসাবে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি তাঁর পরিবারের সকলকেই দলের সাথে যুক্ত করেন। উত্তর ২৪ পরগণার নৈহাটি থেকে শ্যামনগর পর্যন্ত তৎকালীন পার্টি ইউনিটের সর্বত্রই তিনি সুপরিচিত এবং সক্রিয় কর্মী হিসাবে ভূমিকা নেন। সে সময় দলে হাতে-গোনা কয়েকজন কর্মী ছিলেন। পার্টিজীবনে নানা ঘাত প্রতিঘাতে, দুঃসময়ে যাঁরা সেদিন দলকে রক্ষা করেছেন এবং এগিয়ে নিয়ে গেছেন, তাঁদের মধ্যে কমরেড ইন্দ্রানী হালদার ছিলেন অন্যতম। দলের মুখপত্র গণদাবীর প্রচারে তিনি প্রথম থেকেই নিরলস ছিলেন। তিনি একজন শিক্ষিকা, বিশেষত ভাটপাড়া মডেল গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে এলাকায় শ্রদ্ধা অর্জন করেন। শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। গত শতাব্দীর আশির দশকে যে শিক্ষা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তিনি তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় নারী নির্যাতন বিরোধী এবং নারীমুক্তি আন্দোলনে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে গেছেন। অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের জেলা সম্পাদক এবং সভাপতির দায়িত্ব সামলেছেন। সংগঠনের রাজ্যস্তরেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন এবং সহসভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

একজন দৃঢ়চেতা, স্পষ্টবক্তা, নিষ্ঠাবান কর্মী হিসাবে তিনি সংগঠনে গভীর ছাপ রেখে গেছেন।

কমরেড ইন্দ্রানী হালদার লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

এইচ এস দোরেস্বামীর জীবনাবসানে দলের কর্ণাটক রাজ্য কমিটির শোকজ্ঞাপন

কর্ণাটকে গত ২৬ মে প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী এইচ এস দোরেস্বামী শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। চরিত্রের সরলতা, নিপীড়িত মানুষের প্রতি দরদ এবং সংগ্রামী চেতনার কারণে যুবপ্রজন্মের কাছে তিনি ছিলেন প্রেরণাস্বরূপ। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক জ্ঞাপন করে এস ইউ সি আই (সি)-র কর্ণাটক রাজ্য কমিটি মন্তব্য করেছে, এই মৃত্যু রাজ্যের ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে বিরাট ক্ষতি।

দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে শ্রী দোরেস্বামী শোষিত মানুষের স্বার্থরক্ষায় সরকারের প্রতিটি জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। সাম্প্রদায়িক ভাবধারা ও রাজনীতির বিরুদ্ধেও তিনি সারা জীবন সংগ্রাম করে গেছেন। গত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে এস ইউ সি আই (সি) -র সঙ্গে তাঁর আবেগময় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আমাদের দল, গণসংগঠন ও জনগণের ফোরামগুলির উদ্যোগে বহু গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে তিনি সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন।

আশাকর্মীদের সারা ভারত ধর্মঘট সফল

১৫ মে এক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ ভারতে কোভিড রোখার বিশেষ দায়িত্ব আশাকর্মীদের ওপর অর্পণ করেন। ফলে প্রতিদিন ঘুরে ঘুরে কোভিড-আক্রান্তদের চিহ্নিত করা, পরীক্ষা করানো, দেখভাল করা, ওষুধ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মা-শিশুদের সমস্ত পরিষেবা দেওয়ার দায়িত্বও পালন করে যেতে হচ্ছে আশাকর্মীদের। এবং অন্য রাজ্যের মতো এ রাজ্যেও কোনও রকম ট্রেনিং ও সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াই এ সব কাজ তাঁদের করতে হচ্ছে। অনিয়মিত ও অতিসামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এই অমানুষিক পরিশ্রম করতে বাধ্য হলেও আশাকর্মীদের এমনকি স্বাস্থ্যকর্মীর স্বীকৃতিটুকুও নেই। এই অবস্থায় তাঁরা শারীরিক ও মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত, অনেককেই কোভিডের শিকার হতে হচ্ছে।

করোনা সংক্রান্ত কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে মাসিক অতিরিক্ত ১৫ হাজার টাকা আশাকর্মীদের প্রদান, কোভিড সংক্রমিত প্রতি কর্মীকে ১ লক্ষ টাকা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা, ব্লক মেডিক্যাল অফিসারের নেতৃত্বে সমস্ত ধরনের স্বাস্থ্যকর্মীর সম্মিলিত টিমের মাধ্যমে আশাকর্মীদের কাজ করানো, উপযুক্ত সুরক্ষা সামগ্রী এবং পারিশ্রমিক প্রদান, কোভিডে মৃত আশাকর্মীর পরিবারকে ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং সমস্ত কর্মী ও তার পরিবারের চিকিৎসার ব্যবস্থা ইত্যাদি দাবিতে ২৪ মে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত 'স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া'র পক্ষ থেকে ২৪ ঘন্টা সারা ভারত ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল।

দেশ জুড়ে নানা রাজ্যে আশাকর্মীরা এ দিনের ধর্মঘটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামিল হন। প্রতিটি রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবিগুলি পেশ করা হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন এও জানিয়েছেন, দাবি আদায় না হলে আশাকর্মীরা বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবেন।

জীবনাবসান

বাঁকুড়া জেলার ওন্দা থানার লোদনা অঞ্চলে মানখামার গ্রামের কর্মী কমরেড রমাকান্ত ব্যানার্জী ১৭ মে বিকালে বার্ধক্যজনিত কারণে নিজের বাড়িতেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

১৯৭৪ সালে দুর্গাপুরে চাকরিসূত্রে দলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ গড়ে ওঠে। প্রয়াত কমরেড বাদশা খান ও বাঁকুড়ার বর্তমান জেলা সম্পাদক কমরেড জয়দেব পালের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল রমাকান্ত ব্যানার্জীর। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শ অনেক মানুষের মধ্যে যাক, এই আকাঙক্ষা তাঁর ছিল। গণদাবী ও পার্টির পুস্তক পড়তেন ও অন্যদের পড়ার জন্য দিতেন। পায়ে হেঁটে যেতেন ৪-৫টি গ্রামে বৈঠক করার জন্য। কখনও নেতাদের ডাকতেন। বিশেষ বড় কোনও মিটিং জেলায় হলে তিনি উপস্থিত হতেন। জগদল্লা লোকাল কমিটির বিশেষ কর্মসূচিতেও আসতেন। পার্টি নেতা-কর্মীদের খোঁজ খবর নিতেন। মারা যাবার সাত দিন আগেও পার্টির কাজকর্ম বিষয়ে খোঁজ নিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে দলের মধ্যেই ছিলেন। অনেক অভাব অনটন সত্ত্বেও দলকে ভালবেসেছেন। ওন্দা থানার মধ্যে তিনিই প্রথম এস ইউ সি আই (সি) দলে যোগ দেন।

কমরেড রমাকান্ত ব্যানার্জী লাল সেলাম

কলকাতা জেলায় দলের বড়িশা লোকালের কর্মী কমরেড বাবলু পাল কোভিডে আক্রান্ত হয়ে জোকা ইএসআই হাসপাতালে ১০ মে গভীর রাতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর।

কমরেড বাবলু পাল যৌবনে 'বড়িশা সংস্কৃতি পরিষদ' এর কর্মকান্ডে আকৃষ্ট হন। জনসাধারণের প্রতি গভীর মমত্ববোধ থেকে নানা সামাজিক কাজকর্মে তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ওই অঞ্চলে দলের তৎকালীন জেলা সম্পাদক কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জীর রাজনৈতিক ক্লাসের আলোচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দলের সংস্পর্শে আসেন। এরপর থেকে তিনি বহু দায়িত্ব পালন করে গেছেন। প্রথমে যুব সংগঠন ডিওয়াইও-র সাথে যুক্ত ছিলেন, পরে ট্রেড ইউনিয়নের কাজ শুরু করেন। ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হাসপাতাল ইউনিয়ন গড়ে তোলায় তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৮৮ সালে প্রথম পার্টি কংগ্রেসের সময় কমরেড পাল দলের সদস্য পদ পান।

১৯৯৪ সালে বড়িশা অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ-এর অধীনে বৃত্তি পরীক্ষা পরিচালন কমিটির কাজ শুরু করেন। এছাড়াও আমতলা, পৈলান, বিষ্ণুপুর অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে দায়িত্ব নিয়ে বৃত্তি পরীক্ষার কাজ করছিলেন। 'শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চ'-র কলকাতা দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এই অঞ্চলে মনীষী স্মরণের বিভিন্ন কমিটির কাজে তাঁর প্রশংসনীয় ভূমিকা ছিল। এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলির বিস্তার নিয়ে যেমন তিনি স্বপ্ন দেখতেন, তেমনি অন্যদের প্রভাবিত করতেও আপ্রাণ চেষ্টা করে যেতেন।

কমরেড বাবলু পাল যে কোনও কাজই আন্তরিকভাবে করতেন। কাজ করতে গিয়ে কোনও ভুল হলে ছোটদের কাছ থেকেও কঠোর সমালোচনা হাসিমুখে নিতেন। নির্দ্বিধায় ছোটদের নেতৃত্বে কাজ করতেও তাঁর কোনও অসুবিধা হয়নি।

তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল সদাহাস্যময় এক হৃদয়বান কর্মীকে।

কমরেড বাবলু পাল লাল সেলাম

বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে স্মরণসভা

২৮ মে বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের স্মরণসভা হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগণার প্রাক্তন সম্পাদক সহদেব নস্কর, কোচবিহারের প্রাক্তন জেলা সম্পাদক কাজল চক্রবর্তী এবং কলকাতার রবীন্দ্র শিক্ষায়তনের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক কাশীনাথ রাই, দলিত হরিজন কল্যাণ বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তন শিক্ষক উপেন্দ্র চন্দ্র ভক্ত, স্বামীজি শিক্ষা নিকেতনের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অজিত মজুমদার, রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অনুপ ঘোষ, টাকি গভর্নমেন্টস্পনসর গার্লস স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষিকা অঞ্জু সাহা এবং ফতেপুর নগেন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের কর্মরত শিক্ষিকা নার্গিস পারভিন প্রমুখের স্মরণসভা করোনা অতিমারির জন্য একত্রে অনলাইনে করতে হয়েছে। প্রধান বক্তা ছিলেন সমিতির পূর্বতন সাধারণ সম্পাদক ও শিক্ষক নেতা কার্তিক সাহা এবং শিক্ষক নেতা শিশির সরকার।

প্রয়াত নেতৃবৃন্দের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের পর শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠ করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক আনন্দ হাণ্ডা। প্রধান বক্তা কার্তিক সাহা প্রয়াত নেতৃবৃন্দের সংগ্রামী জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শিক্ষা ও শিক্ষক স্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য শিক্ষকদের আহ্বান জানান।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com